নীল সাগরের হাতছানি

নীল সাগরের হাতছানি

সুফিয়া আখতার

নীল সাগরের হাতছানি
সুফিয়া আখতার
প্রকাশনায়
ছায়ানীড়, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৫৫২-৪৬০৯৯৪, ০১৫৫৮-৪০৫৪৫৮
সম্পাদনা সহযোগী
হায়দার রাহমান
প্রকাশক
তাওহীদ, ০১৭৩৮-৬৪৪২৫৩
বর্ণ বিন্যাস
ছায়ানীড় কম্পিউটার।
প্রকাশকাল
জুলাই- ২০১৪
প্রচ্ছদ
কৃষ্ণ
বাঁধাই
আবু তালেব বুক বাইন্ডিং
১০৪, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য
৩০০/- (তিনশত টাকা) মাত্র।
ISBN: 978-984-91108-5-9

Nil Sagorer Hatsani by Sufia Akter.
Published by Tauhid, Chayyanir.Shantikunja More, Bisic Road, Thanapara, Tangail, 1900.
Date of Publication August 2014
Price: TK. 300/- (Three Hundred Only)

উৎসর্গ

আমার শ্রদ্ধেয়
পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ি ও মিয়া ভাই
যাদের অনুপ্রেরণায় আমি
সাফল্যমণ্ডিত।

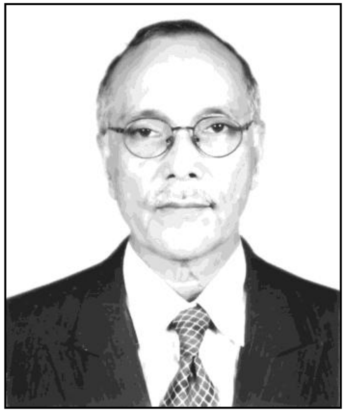

বাণী

জীব জগতে প্রত্যেক প্রাণীই তার মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে নানা ভঙ্গিতে, নানা পদ্ধতিতে। একমাত্র মানুষই তার মনের ভাব প্রকাশ করে মুখে ও লেখনির মাধ্যমে। এরমধ্যে মুখে বক্তৃতার মাধ্যমে যে ভাব প্রকাশ করা হয়, তার স্থায়িত্ব থাকে কম। অন্যদিকে লেখনির মাধ্যমে একজন মানুষ তার মনের যত ভাবনা রেখে যায়, তার স্থায়িত্ব থাকে অনেকদিন। এজন্যই কবি, সাহিত্যিক, লেখকরা পৃথিবীর মানুষের কাছে বেঁচে থাকেন বহুকাল। এরা একদেশের মানুষ হয়েও বেঁচে থাকেন পৃথিবীর প্রায় সব দেশে, সবার কাছে। আমার স্ত্রী সুফিয়া আখতার শিক্ষকতা পেশায় জীবন কাটিয়ে অবসর জীবনে তাই বেছে নিয়েছে সাহিত্যচর্চার কাজ। ইতোমধ্যে তার 'ফেলে আসা গাঁয়ে' বইখানি ও বিভিন্ন ম্যাগাজিনে প্রকাশিত লেখাগুলো পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়েছে। আশা করি, 'নীল সাগরের হাতছানি' বইখানি সবার কাছে ভালো লাগবে। কেননা এতে আছে জীবনের সব বিচিত্র ভাবনা-চিন্ড়া, সব ধরনের অনুভূতি ও নানা তথ্য। আমি তার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

মো. ছাদের আলী মিঞা
প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক,
বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়
ও সাবেক জেলা শিক্ষা অফিসার,
টাঙ্গাইল।

সূচি

১। নীল সাগরের হাতছানি ---০৯
২। মা ---১৫
৩। আমাদের রৌদ্রসোনা ---২২
৪। সেদিনের মেলা --২৬
৫। আমার মা --৩০
৬। আমার কর্মজীবন ---৩৫
৭। আমার বাবা ---৪৩
৮। কড়ির পুতুল ---৫২
৯। মিয়াভাই --৫৫
১০। শাহ বাজপাখি ক্যান্সার -------------------------------------৬০
১১। ঈদ যুগে যুগে --৬৩
১২। সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি -------------------------৬৮
১৩। টেলিফোন ---৭৫
১৪। ঈদুল ফিতর --৮০
১৫। কোরবানির গরু --৮৫
১৬। কারবালা ---৯০
১৭। বসন্ড় বিলাপ ---৯৪
১৮। শ্বশুরবাড়ি ---৯৭
১৯। জামাই উপাখ্যান ---১০৫
২০। বক্ষে আমার কাবার ছবি -----------------------------------১১০
২১। জিয়ারতে মদিনা ---১১৮
২২। নারীকুলের শ্রেষ্ঠ রমণী -----------------------------------১২২
২৩। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মেরাজ--------------------১২৯
২৪। ভারত ভ্রমণ ---১৩৯

নীল সাগরের হাতছানি

আলণ্ঢাহতায়ালা মহাপরাক্রমশালী ও বিজ্ঞানময়। আসমান ও জমিনে যা কিছু, সবই আলণ্ঢাহ সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে পৃথিবীর সর্বত্রই পানি ছিলো। আদি অবস্থায় পানি থাকার কারণে জমিন দুলতে থাকতো। আলণ্ঢাহ পানির উপর পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করে পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রেখেছেন। পৃথিবীতে অনেক বড় বড় সাগর-মহাসাগর রয়েছে। আলণ্ঢাহর সৃষ্ট এই বিশাল সাগর তাঁর কুদরতি নমুনা।

বিপুলা পৃথিবীর অনেক অংশ জুড়েই রয়েছে এই বিশাল সাগর। আমাদের বাংলাদেশের দক্ষিণে রয়েছে বঙ্গোপসাগর। সমুদ্রবক্ষে অজস্র সম্পদ। নানা প্রজাতির মৎস্যসম্পদে ভরপুর আমাদের এই সাগর। রূপালি ঢেউয়ের সাথে মিতালি করে জেলেনৌকায় চলে মাছ ধরার পালা। উপকূলীয় এলাকার মানুষের জীবন ও জীবিকার জন্য এই মৎস্য শিকার অপরিহার্য। প্রবাল, শামুক, ঝিনুক, কচ্ছপ সমুদ্রের সম্পদ। সমুদ্রপাড়ের মানুষেরা সমুদ্রনির্ভর জীবনযাপন করে। তীরে রয়েছে বিশাল বৃক্ষরাজি- নারকেল, সুপারি, তাল-তমাল বৃক্ষ। তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠেছে দোকানপাটের পসরা। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের বিনোদনের জন্য রয়েছে বিলাসবহুল হোটেল। সমুদ্রের সমৃদ্ধি আমাদের নতুন দিগন্ড়ের দ্বার খুলে দিতে পারে। উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সম্ভাবনাময় বাংলাদেশ সমুদ্র-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠবে।

"দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশির বিন্দু।"

কবির এই কথাগুলো আমাদের বাংলাদেশের চেনা পরিসরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে মনে করিয়ে দেয়।

ঘর মানুষকে আশ্রয় দান করে, আর প্রকৃতি ডাকে বাইরের পানে। বিপুল বিশ্বের অপরিচিত জগৎ ও রহস্য মানুষকে আকর্ষণ করে। সেই দুর্বার আকর্ষণে মানুষ ছুটে বেড়ায় আনন্দ উপভোগের উপাদানের খোঁজে। নদী-গিরি, পাহাড় পর্বত, সিন্ধু, মর˜, নগর-রাজধানী এই সব বিষয় ভ্রমণপিপাসু ও প্রকৃতিপ্রেমী মানুষকে আকর্ষণ করে। আমার স্বামী মো. ছাদের আলী মিয়া দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন বিন্দুবাসিনী বয়েজ হাইস্কুলে। জেলা শিক্ষা অফিসার হিসাবে উনি বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত। প্রায় প্রতিবৎসর বিদ্যালয়ে বনভোজন ছাড়াও পারিবারিকভাবে তিনি আনন্দভ্রমণের আয়োজন করতেন। তার ছোটবেলা কেটেছে উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে খোলামাঠে দুরন্ড়পনার মধ্য দিয়ে। মেঠোপথের বাঁকে বাঁকে রাখালি বাঁশির সুর শুনে, শাপলা-শালুক আর বিল-ঝিলে মৎস্য শিকার করে কেটেছে তার ছেলেবেলা। এসব ছিলো তার নিত্যদিনের আনন্দ অনুষঙ্গ। চাকরিজীবনে সহকর্মীদের ভ্রমণে উৎসাহী করতেন। নিজ উদ্যোগে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের আয়োজন করেছেন। সেই সুবাদে একবার প্রথম পারিবারিকভাবে আমাদের কক্সবাজার সমুদ্র দর্শনে যাওয়ার সুযোগ হয়। সাথে ছিলো মেয়ে জামাতা, নাতনি মাহীন। দ্বিতীয়বার সমুদ্রদর্শন আমার জীবনের আনন্দঘন মুহূর্ত। আমার স্বামী তখন বাসাইল সরকারি গোবিন্দ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। ভ্রমণের আয়োজন হলো স্কুলের স্টাফদের পরিবারসহ। হেভাজন খান সুর, আল-মামুন, বর্তমানে বিন্দুবাসিনী হাইস্কুলে কর্মরত। শ্রদ্ধেয় রমজান আলী মৌলভী, শিক্ষক ওয়ালিউল- াহ, হাস্যরসিক নিমাই বাবু, নবীন শিক্ষক হাফিজুর রহমান, আমার ছেলে শহিদুলণ্ঢাহ কায়ছার সুমন, বর্তমানে বিন্দুবাসিনী বালক উচ্চবিদ্যালয়ে কর্মরত। খুব উপভোগ্য ছিলো সেই ভ্রমণপ্যাকেজ। সেই ভ্রমণে বয়সের প্রভেদ ভুলে নবীন তার˜ণ্যে মেতে ওঠেছিলো সবাই। ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে আবার সুযোগ হলো সাগর দর্শনে। এবার আমরা মেয়ে-জামাতা, নাতি-নাতনি মাহীন, হাসি-খুশি। মেজোবুজি দুলাভাই উনাদের নাতনি শিমুল, তাপসী। ফজরের নামায পড়ে মাইক্রোবাসে চড়ে বাড়ি হতে রওনা হলাম। ভোর ৬ টায় টঙ্গীতে নাতনি নাজমার বাসায় পৌঁছলাম। ওখানে যথেষ্ট আন্ড়রিকতার সাথে নাস্ড়া আপ্যায়ন হলো। সেখান থেকে ঢাকা বাইপাস হয়ে রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাস, নরসিংদী, কুমিলণ্ঢা, ভৈরব, সীতাকু˜ হয়ে চট্টগ্রাম। কক্সবাজার পৌঁছলাম সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে। রাতের অন্ধকারে বিদ্যুৎবাতি ঝলসিত কক্সবাজারকে তখন তারকাখচিত নগরী

বলে মনে হলো। হোটেলে ওঠতে কোনো সমস্যা হলো না। আগেই হোটেল রিজার্ভ করা ছিলো, হোটেল সিগাল। হোটেলে ওঠে ফ্রেস হয়ে নাস্ড়া সেরে বিশ্রামের পর সারাদিনের ভ্রমণক্লান্ড়ি দূর হলো। সেজন্য রাতের ঘুম ভালোই হলো। তবে মাহীন, শিমুল তাপসী, হাসি-খুশির অপেক্ষা, কখন সকাল হবে, কখন সমুদ্রসৈকতে যাবে এই রোমাঞ্চে। পরের দিন ভোর ৬ টায় নাস্ড়া সেরে সমুদ্রদর্শনে চলে গেলাম।

সর্বশক্তিমান আলণ্ঢাহর অপূর্ব সৃষ্টি এই বিশাল সমুদ্র। যার তীরে দাঁড়ালে আলণ্ঢাহর শ্রেষ্ঠত্ব এবং কুদরতি নমুনার নিদর্শন পাওয়া যায় এবং নয়ন-মন জুড়িয়ে যায়। আলণ্ঢাহ পাক মানব কল্যাণে পৃথিবীর সকল বস্তুই সৃষ্টি করেছেন। সমুদ্রবক্ষে রয়েছে অফুরন্ড় জলজসম্পদ; যা আমাদের দেশকে সমৃদ্ধ করতে পারে। গ্যাস, নানা প্রজাতির মাছ, শামুক এই দেশকে উন্নতির দ্বারপ্রান্ড়ে নিয়ে যাবে কোনো একদিন। ভোরের উষ্ণ হাওয়া গায়ে মেখে, সৈকতের বালিতে পা ডুবিয়ে আমরা সমুদ্রপাড়ে পৌঁছে গেলাম। নাতনিরা ছুটোছুটি করে পানিতে নেমে গেলো।

মাহীন, শিমুল তাপসী বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস নিয়ে পানিতে অনেক দূর পর্যন্ড় নেমে গেলো। আছড়ে পড়া ঢেউয়ে কখনো ওরা আড়ালে পড়ছিলো, কখনো ওদের হাসিমাখা উচ্ছল মুখ দেখা যাচ্ছিলো। হাসি-খুশি পানিতে ভয় পায়। তবুও সাবধানতার সাথে আধা গা ডোবা পানিতে অনেকক্ষণ আনন্দ করলো। সকাল হতেই নানা বয়সের দেশি-বিদেশি সৌন্দর্যপিপাসু মানুষের ভিড়ে সমুদ্রপাড় মুখর হয়ে ওঠে। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে তীরে মিশে যাচ্ছে। পানিতে নামা শিশুরা আনন্দে মিশে যাচ্ছে সেই ঢেউয়ের সাথে। তীরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের সাথে আসা প্রবাল, নুড়ি, শামুক, ঝিনুক, সৈকতে থেকে যাচ্ছে। আমরা দুইবোন তাঁবুতে বসে অপার সমুদ্রের ঢেউভাঙা গর্জন ও দূর থেকে ভেসে আসা সাম্পান, মাছ ধরার নৌকার দৃশ্য দেখছি। মন ভরে গেলো। ঢেউয়ের সাথে তাল মিলিয়ে জাহাজ, সাম্পান, ট্রলার বয়ে চলেছে। দূর থেকে ভেসে আসা এইসব জলযান যখন উত্তাল ঢেউয়ের আড়ালে পড়ে, মনে হয় এই বুঝি ডুবেই গেলো। দৃষ্টি না ফেরাতেই আবার চকিতে চোখে পড়ে ঐ সব সাম্পান। ঢেউয়ের সাথে পালণ্ঢা দিয়েই সাম্পান জেলেনৌকাগুলো সারা বৎসর সমুদ্রে পাড়ি জমায়। সমুদ্র উত্তাল হলে তার গর্জনে কান ভারী হয়ে আসে। সে গর্জন অন্যরকম অনুভূতির কথা মনে করিয়ে দেয়। সমুদ্রস্নান ছেড়ে নাতনিরা বোটে চড়ে নিরাপদ এলাকা পর্যন্ড় ঘুরে এলো। আমি তীরে বসে বিশাল

সমুদ্রের সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। বেলা বাড়ার সাথে সাথে আমরা তখনকার মতো হোটেলে চলে এলাম।

গোসল, দুপুরের খাওয়া ও যোহরের নামায শেষে বিকালে আবার সমুদ্রসৈকতে সবাই চলে গেলাম। জোয়ার-ভাটা সমুদ্রের নিত্যনতুন খেলা। প্রতিদিন ১১টার পর থেকে উত্তাল হয়ে ওঠে সমুদ্র। কূল ছাপিয়ে তীরে দোকানপাট ও স্থাপনার কাছাকাছি জোয়ারের পানি চলে আসে। আবার বিকাল ৪ টার পর ভাটার টানে সব পানি সমুদ্রে চলে যায়। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। খুবই মনোরম। জোয়ার-ভাটা প্রকৃতির নিয়মেই হয়ে আসছে। এখানে সমুদ্র তার নিজের আইন এবং শাসন মেনে চলছে। ফুলে-ফেঁপে ওঠা সমুদ্রের উত্তাল তালে তালে ভেসে যাচ্ছে জাহাজ। সাম্পান জেলেনৌকা ঢেউয়ের তালে তালে ভেসে যাচ্ছে। দূরে তাকালে মাছ ধরার ট্রলারগুলোর কিছু অংশ দেখা যায়। কোনোটা আবার উচ্চ ঢেউয়ের আড়ালে মনে হয়, এই বুঝি হারিয়ে গেলো। আমরা সমুদ্র তীরে অস্ড় যাওয়া সূর্যের দৃশ্য দেখার জন্য অপেক্ষায় বসে রইলাম। গোধুলিলগ্নে সমুদ্রের দিকে তাকালে মনে হয়, আকাশ ও সমুদ্র একসঙ্গে মিশে আছে। সোনালি সূর্যের আভা ডানায় মেখে বক, গাঙচিল, পানকৌড়ি, মাছরাঙা ঝাঁকে ঝাঁকে ঘরে ফিরছে। দিনের ক্লান্ড়ি মুছে দিতে সূর্য যেন আঁধারে মুখ লুকাচ্ছে। নানা বর্ণিল পোশাকে ছোট ছোট শিশুদের কোলাহল লাল-নীল প্রজাপতির মতো মনে হয়। অস্ড়গামী সূর্যের রঙিন আভা ক্রমশ ম্লান হতে চলেছে। সৌন্দর্যপিপাসু পর্যটক সবটুকু আনন্দ মনের কোণে জমা রেখে ঘরে ফেরার জন্য তৈরি।

সমুদ্রের বক্ষে সূর্য ডোবার দৃশ্য অতি মনোহর। সারাদিনের আনন্দ-উল- াস শেষে যখন আমরা ঘরে ফেরার জন্য তৈরি, সূর্যও তখন অস্ড় যাওয়ার জন্য ব্যস্ড়। নিয়মের বেড়িবাঁধ ভেঙ্গে নয়, প্রকৃতির নিয়মেই পরিশ্রান্ড় সূর্য একসময় আমার চোখে চোখ রেখে সাগর বুকে মুখ লুকায়। এ দৃশ্য অপূর্ব। ডুবন্ড় সূর্যের সোনালি আভার ফাঁকে ফাঁকে সাদা আকাশী হালকা মেঘে পশ্চিম আকাশকে আরও অপরূপ করে তোলে। অন্ধকার হতে হতেই সমুদ্রপিয়াসী মানুষ সেদিনের পালা শেষ করে ঘরে ফিরে আসে। আমরাও হোটেল সিগালে চলে এলাম।

আবহাওয়ার বৈরী আচরণে প্রতিবৎসর সমুদ্রে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়। উত্তাল সমুদ্র ফুঁসে ওঠে ভয়ঙ্কররূপে। সেই ভয়ঙ্কর রূপের অপরূপ শোভাও দৃষ্টিনন্দন। সমুদ্রপাড়ের বিভিন্ন বয়সের মানুষেরা সাগরের নোনাজলে ভেসে আসা শামুক-ঝিনুকের বাহারি জিনিস তৈরি করে পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমুদ্র আনন্দ বিলিয়ে শুধু মনকে রাঙা করে দেয় না; প্রতিবৎসর

প্রতিভাধর জীবনও কেড়ে নেয়। সমুদ্রস্নানে অতিরঞ্জিত আনন্দ উপভোগ করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত উদীয়মান তরুণেরা প্রাণ হারায়। সেদিনের ঘটনায় ক্লোজআপ ওয়ানের নন্দিত কণ্ঠশিল্পী আবিদ ও তার বন্ধু জ্যোতি প্রাণ হারালো। ক্ষুধিত সমুদ্র এভাবেই কোনো না কোনো মায়ের কোল শূন্য করে দেয়। যুগ যুগ ধরে সমুদ্র আমাদের আনন্দ-বেদনার সাক্ষী হয়ে আছে, থাকবে। তবুও আমরা সমুদ্র ভালবাসি। ভালবাসি ধরণীর এই জলরাশি। কবিগুরুর কথায়−

যদি অবগাহন করিতে চাও,
এসো নেমে এসো হেথা গহন তলে।
নীলাম্বরে কিবা কাজ তীরে ফেলে এসো আজ।
ঢেকে দিবো সব লাজ সুনীল জলে।
সোহাগ তরঙ্গরাশি অঙ্গখানি দিবে গ্রাসি।
উচ্ছ্বাসি পড়িবে আসি উরসে গলে
ঘুরে ফিরে চারিপাশে কভু কাঁদে কভু হাসে
কুলুকুলু কলভাষে কত কী ছলে!

সময়ের আবর্তে আমাদের দেশের লোকসংখ্যা বাড়ছে। বাড়ছে সৌন্দর্যপিপাসু ও ভ্রমণবিলাসী মানুষের সংখ্যা। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের ফেলা ও সমুদ্রের ঢেউয়ের সাথে ভেসে আসা আবর্জনা সমুদ্রপাড়ের পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন করে তোলে। বিগত সময়ের চেয়ে এবার সমুদ্রসৈকত অনেক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। আন্তঃজেলা রেডক্রস সোসাইটির উদ্যোগে এবার সমুদ্রপাড়ের পরিবেশ সুন্দর। পর্যটক আকর্ষণের জন্য রেডক্রস ৭ দিনব্যাপী পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। স্কাউট শিক্ষক ওয়াজেদ আলী, (বর্তমানে প্রধান শিক্ষক) গোবিন্দ সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, বাসাইল, সারা দেশের স্কাউট কর্মী নিয়ে সাগরপাড়ের নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার অভিযান পরিচালনা করছেন। রেডক্রস র‌্যালি নাটক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে অবহিত করছে। ঢেউয়ে ভেসে আসা ও পর্যটকদের ফেলা যাবতীয় আবর্জনা রেডক্রস সদস্যরা সপ্তাহব্যাপী পরিষ্কার করছে। এই আয়োজনে

সমুদ্রসৈকতের শোভা যেমন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি দর্শক, পর্যটক নিরাপদে চলাফেরা করছে। স্থানীয় লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য রেডক্রস সদস্যরা কোরাস গাইছে:

ভালো আছি ভালো থেকো
সমুদ্রের পরিবেশ ভালো রেখো।

মা

(বিশ্ব মা দিবস উপলক্ষে)

মধুর আমার মায়ের হাসি চাঁদের মুখে ঝরে
মাকে মনে পড়ে আমার মাকে মনে পড়ে।
বিশ্বভুবন মাঝে যাহার নেই কো তুলনা।
সে যে আমার মা, সে যে আমার মা।

১৩ মে বিশ্ব মা দিবস। জীবিত-মৃত পৃথিবীর সকল মাকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মরণের দিন। নিত্যদিন হোক মায়ের জন্য। মায়ের কোনো বিকল্প নেই। মায়ের তুলনা শুধুই মা। যে মা সবসময় ব্যাকুল থাকেন সন্তানের মঙ্গলের জন্য। সন্তান দুটি হোক বা সাতটি, প্রত্যেকের জন্যই মায়ের অন্তর সমভাবে বণ্টন করা। এর পরিমাপ কোনো নিক্তিতে পরিমাপ করা যায় না। মায়া-মমতায়, স্নেহ-বাৎসল্যে মা তার প্রতিটি সন্তানকে বড় করে তোলেন। মা না খেয়ে সন্তানের মুখে আহার তুলে দেন। অসুখে-বিসুখে রাত জেগে সেবা করেন। ডাক্তার-কবিরাজ, পথ্যের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। মা নামাযে আল্লাহর নিকট সন্তানের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য মায়ের সে কী পরিশ্রম! বিশ্বভুবন মাঝে মায়ের বিকল্প শুধুই মা।

সেই মাকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করার কথা মনে করিয়ে দেয় বিশ্ব মা দিবস। একজন মা তার দায়িত্ববোধ থেকেই সন্তান প্রতিপালন করেন না; মায়ের নাড়ি ছেঁড়া ধন সন্তান। সেই রক্তের বন্ধন থেকেই মায়ের অন্তরে সন্তানের জন্য প্রগাঢ় অপত্য ভালবাসা; যা পৃথিবীর কোনো ভালবাসার সাথে তুলনা হয় না। সংসারের শত ঝামেলার মাঝে মা তার শিশুকে আদর-সোহাগে ভরে

দিয়ে তৃপ্তি পান। মাতৃত্বের তৃপ্তির হাসি চাঁদের হাসিকেও ম্লান করে দেয়।

তাই মায়ের প্রতি আমাদের যথেষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। মায়ের কত লিটার দুধ আমরা পান করেছি; কিন্তু মাকে এককাপ দুধ কোনো সন্তান এগিয়ে দেয় কি? আমরা দায়িত্ব অনুভব করি; কিন্তু পালন করি না। বাবা-মা মারা গেলে আমরা বিলাপ করি সাতদিন, ঘটা করে চল্লিশা পালন করি। কিন্তু বাবা-মা বেঁচে থাকতে তাদের আনন্দের জন্য বিশেষ কোনো মুহূর্ত উপহার দিতে ক'জন সন্তান পারে?

মা তার সন্তানের জন্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এমনকি জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে পারেন। এক বিধবা মা কষ্ট করে সযতনে ছেলে বড় করেছেন। সেই যুবক ছেলে একটি মেয়ের প্রেমে পড়লো। মেয়েটি তার প্রস্তাবে সাড়া দেয় না। ছেলেটি মেয়েটির পিছে লেগেই রইলো। একদিন বিরক্ত হয়ে মেয়েটি বললো, আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি হতে পারি; যদি তুমি তোমার মায়ের হৃদপিণ্ড আমাকে উপহার দিতে পারো। ছেলেটি বললো, আমি আমার মায়ের অন্তরের ধন, আমার মা আমার জন্য সব পারেন। ছেলে বাড়ি এসে মায়ের নিকট সব ঘটনা খুলে বললো। শুনে মা বললেন, তোমাকে পরম মমতায় বুকের কাছে রেখে বড় করেছি। বাছারে জীবনে তোমার কোনো চাওয়া অপূর্ণ রাখি নাই। 'তুমি আমার আত্মা, তুমিই আমার হৃদয়'। আমি তোমাকে তা না দিয়ে পারি! তুমি আমাকে হত্যা করে হৃদপিণ্ড নিয়ে যাও। তোমার প্রেমিকাকে তুষ্ট করো। আমি চাই আমার হৃদপিণ্ডের বিনিময়ে আমার ছেলে তার প্রেমিকাকে পেয়ে খুশি হোক, সুখী হোক। মাতৃস্নেহে ভরপুর উদার বক্ষখানি মা ছেলের সম্মুখে মেলে দিলেন। ছেলে মায়ের বক্ষ বিদীর্ণ করে হৃদপিণ্ড নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে প্রেমিকার বাড়ির দিকে ধাবিত হলো। উন্মাদের মত ছুটতে গিয়ে পাথরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলো। দুহাত দিয়ে বুকের কাছে ধরা রক্তমাখা হৃদপিণ্ড বলে ওঠলো, 'ব্যথা পেয়েছিস বাবা'? এই তো মা! নিজের জীবন বিপন্ন করে সন্তানের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারে। মায়েরা তো এমনই হয়। মা সন্তানের মঙ্গলের জন্য নিজের আরাম-আয়েশ বিসর্জন দেন। নিবিড় যত্ন ও পরিচর্যার মধ্য দিয়ে তিলতিল করে সন্তানকে গড়ে তোলেন। নিজে না খেয়ে সন্তানের মুখে আহার তুলে দেন। কত না স্বপ্নের সোনালি পাখা সন্তানকে ঘিরে। সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহ চিরন্তন। এই স্নেহ-মমতার বন্ধন শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। পশু-পাখিদের মধ্যেও সন্তান বাৎসল্য অভিন্ন। মা-পাখি নিজে না খেয়ে মুখে করে খাবার এনে ছোট ছানাটির মুখে তুলে দেয়। যতদিন নিজে খাবার খুঁটে না খেতে পারে, ততদিন পর্যন্ত মা-পাখি ছানাকে এভাবেই খাওয়ায়। বিড়াল-মা পাশের বাড়ির হাঁড়ি থেকে মাংসের টুকরা চুরি করে আনে।

মাতৃগর্বে বাচ্চাদের মাঝে ফেলে দেয়। বাচ্চারা কাড়াকাড়ি করে খায়, বিড়াল-মা তাকিয়ে দেখে তৃপ্তি পায়। মা-গাভী মনিবকে ফাঁকি দিয়ে তার বাছুরকে দুধ খাওয়ায়, আর পরম মমতায় তার কোমল দেহ চাটতে থাকে। মাতৃত্বের আস্বাদন পূরণে জীবজগতে সকল প্রাণির মধ্যেই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তেলাপিয়া-মা শত্রুর আক্রমণের ভয়ে চোখের পলকে তার হাজার ছানা-পোনাকে মুখের ভিতর পুরে ফেলে। মাকড়সা-মা ডিম পাড়ার পরই মারা যায়। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়েই মাকে খেয়ে ফেলে। মা-মুরগি চিলের থাবা থেকে ছানা রক্ষার্থে পলকেই সবগুলোকে দুই পাখায় গোপন করে ফেলে মায়ের বক্ষের নিরাপদ আশ্রয়ে।

একজন বস্ড়িবাসী মা স্বপ্ন দেখেছিলেন সুখের সংসারে দুঃখকে জয় করতে। ছেলে বড় হলো, বৌ হলো, নাতি-পুতি হলো। ছেলের হাঁড়িতে মায়ের অন্ন জোটে না। মা ভিক্ষা করেন। মাকে নিয়ে নিত্যদিন ঝগড়া হয়। রিকসাচালক ছেলে বৌকে সামলাতে পারে না। নাতিরা দাদির কাছে আসতে চায়, দাদিকে পছন্দ করে। ছেলের বৌ এ নিয়ে অনুযোগ করে। এ বেলা ও বেলা ঝগড়া লেগেই থাকে। ভিক্ষা করে মা যা রোজগার করেন, সেই আয় তুলে দেন ছেলের হাতে বউয়ের অগোচরে। গোপনে ছেলেকে কাছে ডাকেন, এটা-ওটা খেতে দিয়ে বলেন, বাবারে 'দুপুইরা রইদে ছায়ায় বইসা আরাম করিস'। মায়ের মতো আপন কে আছে? এখনকার মায়েরা নিবিড় পরিচর্যায় সন্ড়ানকে বড় করে তোলেন। সকালে স্কুলের জন্য তৈরি, স্কুলের ব্যাগ গোছানো, টিফিন, পানির বোতল সবই পরম যত্নে গুছিয়ে দেন। নিরাপত্তার জন্য স্কুলে সঙ্গে করে নিয়ে যান। রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে দিনের পর দিন স্কুলগেটে ছুটি পর্যন্ড় অপেক্ষা করেন। বাড়ি এসে আবার সংসারের কাজে লেগে যান। এই সন্ড়ানেরা বড় হয়ে মায়ের এই কষ্টের কথা কি মনে রাখবে?

এ যুগে যৌথপরিবার কমে আসছে। কর্মক্ষেত্রের স্থানেই ছেলে বৌ-বাচ্চা নিয়ে সংসার গড়ে তোলে। তারা কি মায়ের কথা মনে রাখে? কজন ছেলে মায়ের খবর রাখে? মাঝে-মধ্যে ঈদ পূজা পার্বণে বাড়ি আসে। মা-বাবা আদর-যত্ন করে ছেলে-বৌ নাতি-নাতনির জন্য নানা আয়োজনে ব্যস্ড় হয়ে পড়েন।

কোনো কোনো ছেলে কাজের ঝামেলায় বৃদ্ধ বাবা-মার খোঁজ- খবর রাখে না। দৈবক্রমে তারা মাতৃভূমিতে আসে। বাংলাদেশেই চাকরি করে এক মায়ের সন্ড়ান। মা-বাবাই সময় সময় ছেলের বাসায় বেড়াতে যান। মায়ের মৃত্যুর সময় পনের বছর পর ছেলে তার জন্মভূমিতে এলো মায়ের শেষ আশ্রয় গোরস্থানে দাফন করার জন্য। এই হলো আমাদের পারিবারিক প্রেক্ষাপট। কোনো কোনো পরিবারে এখনো যৌথপরিবার টিকে আছে মা-বাবার কারণেই; কিন্তু এখানেও ভিন্ন মত ভিন্ন পথ। মা-বাবার জন্য কদর শ্রদ্ধাবোধ, মূল্যবোধ তেমন নেই। এখানে ভিন্ন জনের ভিন্ন মতের কারণে। মা-বাবার আধিপত্য ক্রমশই কমতে থাকে। সমরাঙ্গনের মতো সংসার জীবনটা বড়ই জটিল ও কুটিল। যে সংসার ঘিরে স্বপ্নের পৃথিবী গড়ে ওঠার কথা, তা আর হয় না। কোনো কোনো পরিবারে বউ-শাশুড়ি, ছেলে-বাবা, মেয়েদের সাথে খুনসুটি লেগেই থাকে। অবস্থাটা এমন পর্যায়ে গড়ায়, শেষ পর্যন্ড় সমস্ড় অপবাদ লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সইতে হয় মা-বাবাকে। ঠাঁই হয় না নিজ হাতে গড়া স্বপ্নপুরী নিজ বাড়িতে। বিদেশি কালচার অনুসরণে আমাদের দেশেও তৈরি হয়েছে ওল্ডহোম- বৃদ্ধাশ্রম। আপন পরিজনবেষ্টিত স্বপ্নের বাড়ি ছেড়ে মা-বাবার শেষ আশ্রয় এই বৃদ্ধাশ্রম। আমাদের মা-বাবা কি সেখানে ভালো আছেন? ওইসব বৃদ্ধাশ্রমে মায়েদের চোখের পানি, দীর্ঘশ্বাস কি আমদের সন্ড়ানের বুক ভারী করে? আধুনিকতার নামে মা-বাবাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে সন্ড়ানের মুখে পরিতৃপ্তির আহার রুচিকর হয়? বড় বাড়ি বড় ফ্ল্যাটে মা-বাবার থাকার জায়গা হয় না। কোনো এক মা এমন দিনের অপেক্ষায় আছেন, যেদিন তার খোকা ও তিনি বৃদ্ধাশ্রমে পাশাপাশি থাকবেন।

মা তার অন্ড়রের ভিতরে দশমাস দশদিন সন্ড়ানকে তিলে তিলে বড় করে তোলেন। তার মনের সুপ্ত বাসনা এই সন্ড়ানকে ঘিরে। প্রসব বেদনার তীব্র কষ্ট সহ্য করে চাঁদপনা একটি সন্ড়ানের জন্ম দিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেন। মায়ের কোল জুড়ে যখন চাঁদপনা একটি ছোট্ট শিশু শোভা পায়, মা পরম তৃপ্তিতে শিশুর ছোট্ট গালে চুমো খেয়ে তার প্রসব বেদনার সকল কষ্ট ভুলে যান। মাতৃত্বের গর্বে তার বুক ভরে যায়।

এক মুক্তিযোদ্ধা ছেলের গোপন আস্ড়ানায় মা দেখা করতে যান। খাওয়ার কষ্ট, থাকার কষ্ট দেখে মা বেদনাতুর হয়ে ওঠেন। সিথানে ছেলের বালিশ নেই। ছেলে মাকে বলেছিলো– মা, আবার আসলে ভাত নিয়ে এসো। মা পরম যত্ন করে ছেলের জন্য ভাত নিয়ে গেলেন। ছেলের খোঁজ পেলেন না। সেই মা

যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ভাত খাননি, সিথানে বালিশ নেননি। মায়েরা যে সন্ড়ানের জন্য নিজের সকল আরাম-আয়েশ ত্যাগ করতে পারেন। কত নিঃস্বার্থ মায়ের ভালোবাসা! সন্ড়ানের সত্তা জুড়ে মায়ের ভালবাসার অবস্থান।

সেই মায়ের আসনখানি সন্ড়ানের মাথার মণি হয়ে থাকুক, বিশ্ব মা দিবসে এই প্রত্যাশা। মা যেন অবহেলিত, পরিত্যক্ত, বঞ্চিত না হয় ছেলে বৌ মেয়ের সংসারে। মায়ের জন্য যেন সন্ড়ানের অন্ড়রে অপরিসীম মমত্ব, শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা আলণ্ঢাহ সৃষ্টি করে দেন। আমাদের মায়েরা যেন স্বজন পরিবেষ্টিত নিজের গড়া সংসারে আপনজনের সাথে চেনা পরিসরে সহাবস্থান করতে পারেন, এটাই কাম্য।

'আল জান্নাতু তাহতিহাল উম্মিহাত' মায়ের পদতলে সন্ড়ানের বেহেশত। আলণ্ঢাহ পাক মায়ের হক তিনগুণ বেশি করে দিয়েছেন। তিন গুণ বেশি সম্মানের অধিকারী করেছেন। মায়ের দাবিকে মজবুত করে দিয়েছেন ১০ মাস ১০ দিন গর্ভে ধারণ করার জন্য, গর্ভের বোঝা বইবার কারণে, প্রসবকালীন কষ্ট সইবার কারণে। মা সেবাদাসী হয়ে হাসিমুখে মলমূত্র পরিষ্কার করেন। অসুস্থ হলে রাত জেগে সেবা করেন। উন্নত ভবিষ্যতের জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। এজন্যই নবী (স.) জোর দিয়ে বলেছেন– 'মায়ের পদতলে সন্ড়ানের বেহেশত'। যদি কোনো নেক-সন্ড়ান তার মা-বাবার দিকে বিনয় ও দয়ার দৃষ্টিতে তাকায়, তার বিনিময়ে আলণ্ঢাহ পাক একটি করে মকবুল হজের নেকি লিখে দেন। আলণ্ঢাহ পাক নিজে বলেছেন- "যে সন্ড়ানের উপর পিতা-মাতা খুশি থাকে, আমিও তার উপর খুশি থাকি"। নবী (স.) বলেছেন– 'যে ব্যক্তি মাতা-পিতা জীবিত পেয়েও সেবা-যত্ন করে নাই, সে নিপাত যাক'। তাই শিশুকালের পরম নিরাপদ আশ্রয় মা-বাবা সুন্দর জীবন গঠনের নিঃস্বার্থ দিশারি মা-বাবা, যৌবনের দিশারী মা-বাবাকে পরম পূজনীয় ও বরণীয় করে গ্রহণ কর‍ুক আমাদের সন্ড়ানেরা। তবেই ভালো থাকবে জগৎসংসারের সকল মা-বাবা ও সন্ড়ানেরা। পবিত্র কোরআনে আলণ্ঢাহ পাক এরশাদ করেছেন, "তোমরা পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমাদের নিকট যদি তাদের একজন বা উভয়ই বৃদ্ধাবস্থায় থাকে, তবে তুমি বিরক্ত হয়ে উঁহ শব্দটিও করো না। তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে বিনয় ও নম্রতার সাথে নত হয়ে থাকবে। মৃত ও জীবিত মা-বাবার জন্য এই দোয়া করবে–

'আলণ্ঢাহুম্মাগ ফিরলি রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানি সগিরা।'

"হে আমার পরোওয়ারদিগার, আমার পিতা-মাতা যেমন কষ্ট করে মহব্বতের সাথে আমাকে লালন-পালন করেছেন, আপনিও তাদেরকে মহব্বতের সাথে গ্রহণ কর‍ুন"।

মাতৃভক্তির মূর্ত প্রতীক ও বিরল দৃষ্টান্ড় স্থাপনকারী মহামানব হযরত মুহম্মদ (স.)। তিনি ভূমিষ্ঠ হয়ে মাতৃক্রোড়ে মাত্র কয়েকদিন অবস্থান করেছেন। এ সময় মাতৃদুগ্ধই ছিলো তার রসনা তৃপ্তির আহার। আরবের প্রথা অনুযায়ী ধাত্রীমাতার নিকট ৫ বৎসর পর্যন্ড় প্রতিপালিত হন। ধাত্রীমাতা হালিমা মাতৃস্নেহেই তাঁকে লালন-পালন করেন। মা হালিমার গৃহে শিশু মুহম্মদের কোনো অযত্ন ও অমর্যাদা হয় নাই। তবুও শিশু মুহম্মদের দুর্বার আকর্ষণ ছিল মায়ের নিকট ফিরে আসার। এমন কি দু'একবার তিনি লুকিয়েও মায়ের নিকট ফিরে আসার চেষ্টা করেছেন। ৬ বৎসর বয়সে মা হালিমা শিশু মুহম্মদকে মায়ের নিকট ফিরিয়ে দেন। এই দুধ-মা হালিমাকে তিনি কোনোদিনও ভুলতে পারেন নাই। বিবি হালিমা যতদিন জীবিত ছিলেন, নবী মুহম্মদ (স.) তাকে মায়ের আসনে স্থান দিয়েছেন। সময়ে সময়ে তার খোঁজ-খবর রাখতেন। মা হালিমা নবী (স.) নিকট যখন আসতেন, প্রগাঢ় মাতৃভক্তি ও শ্রদ্ধায় তাকে বরণ করতেন। একবার আরব দেশে খুব দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ সময় মা হালিমা নবী (স.) নিকট এলেন। সাহাবী পরিবেষ্টিত স্বজনদের সাথে নবী (স.) গুর‍ুত্বপূর্ণ মজলিসে আলোচনায় ব্যস্ড় ছিলেন। মা হালিমাকে দূর থেকে দেখেই ওঠে দাঁড়ালেন এবং গায়ের চাদর বিছিয়ে তার আসনের ব্যবস্থা করলেন। মা হালিমা নবী (স.) এর নিকট কিছু সাহায্যের আবেদন করলে একটি উটসহ মালামাল ও চলি- শটি ভেড়া দিয়ে সাহায্য করেন। নবী (স.) মাতা আমিনার নিকট ফিরে এলে তিনি পিতার কবরস্থান দেখার ইচ্ছা পোষণ করেন। মাতা আমিনা শিশুপুত্র ও একজন পরিচারিকা সঙ্গে নিয়ে মদিনায় উপস্থিত হন। শিশুপুত্রকে মাতা দেখালেন সেই ঐতিহাসিক সমাধি স্থান, যেখানে পিতা আব্দুলণ্ঢাহ চিরনিদ্রায় শায়িত। মাতা দীর্ঘ কাহিনি শোনালেন কিভাবে তার প্রিয় পিতা এখানে সমাধিস্থ হলেন। বালক মুহম্মদ পিতার অভাব অনুভব করলেন। পিতার কবরস্থল জিয়ারত শেষে ফেরার পথে অসুস্থ হয়ে মাতাও মারা গেলেন। বালক মুহম্মদ অনুভব করলেন তিনি এতিম। নবী (স.) সারা জীবনে মায়ের সাথে

প্রথম মদিনা যাত্রা ও পিতৃবিয়োগের কর‍ুণ কাহিনী কোনোদিনই ভুলেননি। মদিনা জুড়ে রয়েছে পিতৃ-মাতৃ বিয়োগের কর‍ুণ কাহিনি। তিনি সাহাবী ও সহচরদের বলে বুঝাতেন, কেন তিনি মদিনাকে এতো ভালোবাসেন। মদিনার

জন্য নবীর (স.) এতো ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ মাতা-পিতাকে ঘিরে। মাতা-পিতার আদর-স্নেহ থেকে বঞ্চিত নবী (স.) পৃথিবীর সকল মা-বাবার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য উপদেশবাণী শুনিয়েছেন। আল- াহর আদেশের কথা উম্মতদের শুনিয়েছেন। এক সাহাবী প্রশ্ন করলেন– হে আলণ্ঢাহর রসুল! আমার সদ্ব্যবহারের হকদার কে? নবী (স.) বললেন- তোমার মাতা। তিনি আরও বললেন, তোমার মাতা জীবিত থাকলে জিহাদের চাইতে তার সেবা করা উত্তম।

আলণ্ঢাহ ও তাঁর রসূলের পর সবচাইতে অধিক সম্মান মর্যাদা ও সদ্ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য হচ্ছেন মাতা। পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা মুসলিম পরিবারের সন্ড়ানের নিকট পিতা-মাতার মর্যাদা আলণ্ঢাহ পাক উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। বার্ধক্যেও পিতা-মাতা সম্মানের সাথে নিশ্চিন্ড় নিরাপদে তাদের অধিকার নিয়ে পরিবারে বসবাস করবেন- এটাই কাম্য।

যুগের পরিবর্তনের সাথে দিন দিন মানুষের মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধ বদলে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের ধরন। আধুনিকতার নির্মম ছোঁয়ায় মায়েরা নিজ পরিবারে ভারী বোঝা হয়ে যান। সর্বত্যাগী মঙ্গলময়ী মা সন্ড়ানের জন্য সর্বসুখ ত্যাগ করতে পারেন। আমাদের মায়েরা সন্ড়ানের জন্য নিজের হৃদপিন্ড উজাড় করে দিতে পারেন। মা কত উদার! মায়ের মন কত স্নেহকাতর! যার মা নেই, সেই বুঝতে পারে তার কী নেই! বাতাসের ছোঁয়া যেমন শরীর জুড়িয়ে দেয়, মা শব্দটিও তেমনি মনকে আন্দোলিত করে। আমাদের ঘরে ঘরে আদর্শ সন্ড়ান গড়ে উঠুক। মায়ের প্রতি যেন সন্ড়ানের প্রগাঢ় ভালোবাসা শ্রদ্ধাবোধ, মমত্ববোধ গড়ে ওঠে। বৃদ্ধাশ্রম নয়, আমাদের মায়েরা যেন ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনি পরিবেষ্টিত নিজ পরিবারে অবস্থান করেন। স্বপ্নের গড়া নিজ সংসারেই যেন সম্রাজ্ঞীর মতো মায়েরা শোভা পান। এটাই সবার কাছে প্রত্যাশা।

আমাদের রৌদ্রসোনা

একটি ছোট্ট শিশুর আগমন মায়ের কোলকে যেমন উজ্জ্বল করে ভরিয়ে দেয়, তেমনি পরিবারের নানি-দাদি স্বজনকে আনন্দে আপণ্ডুত করে। পূর্ণিমার চাঁদও তার কাছে হার মানে। এমনি এক নয়ন জুড়ানো, মন ভুলানো শিশু রৌদ্রসোনা। ধরার মাঝে যেদিন এসেছিলে তুমি, সেদিন কবির ভাষায় স্বজনেরা বলেছিলো-

পার হয়ে কত নদী কত যে সাগর
এই পারে এলি তুই শিশু যাদুকর।
কোন রূপলোকে ছিলি রূপকথা তুই
রূপ ধরে এলি তুই মমতার ভূঁই।
নবনীতে সুকোমল লাবণি লয়ে
এলি কিরে অবনিতে দিগ্বিজয়ে।
কত যে তিমির নদী পারায়ে এলি
নির্মল নভে তুই চাঁদ পহেলি ॥

মা তোমার চাঁদপনা মুখ দেখে তৃপ্ত হয়ে হেসেছিলো। স্বজনেরা নানা বাক্যব্যয়ে তোমাকে আদর সোহাগে মাতিয়ে তুলেছিলো। তোমার আগমনে যে অপার শান্ড়ি এসেছিলো ধরা মাঝে, তা স্বল্পকালীন। ছোট্ট শিশু একটি পরিবারে অনাবিল আনন্দ বয়ে আনে। তাকে ঘিরে নতুন স্বপ্ন দেখে সবাই। মায়ের ভালবাসার আঙিনায় সে তিলতিল করে বেড়ে ওঠতে থাকে। তুমিও একদিন মায়ের আঙিনা ছেড়ে বন্ধু-জগতে বিচরণ শুরু করলে। কিন্তু বেশিদিন তোমার বন্ধুরা তোমাকে ধরে রাখতে পারেনি। নিষ্ঠুর নিয়তির অমোঘ নিয়মের কাছে মা-নানি, খালামণি, সকল বন্ধুকে চোখের পানিতে আপণ্ডুত করে তুমি চলে গেছো না ফেরার দেশে। জন্মের পরেই নানু তোমাকে দু'হাতে তুলে নিয়েছিলো। নানুর হাতে তুমি খাওয়া, গোসল করা সব পছন্দ

করতে। নানু তোমাকে অপত্য স্নেহে প্রতিপালন করতেন।

রৌদ্র, তুমি যেদিন জন্ম নিলে সেইক্ষণে তুমি তীব্রস্বরে কেঁদেছিলে। অপার আনন্দে সবাই হেসেছিলো। মরণব্যাধি লিউকেমিয়া তোমাকে কেড়ে নিলো। সবাইকে কাঁদিয়ে তুমি হাসতে হাসতে চলে গেলে। তোমার মা কাঁদলো, তুমি কাঁদালে সকল মাকে। মায়াময় পৃথিবীতে কুসুম সুবাসে সুবাসিত হয়ে তুমি ধরা মাঝে এসেছিলে। তোমার যেদিন জন্ম হয়েছিল- সেদিন তোমার খালামণি 'তানিয়া বখ্শের জন্মদিন' পালন করছিলো টাঙ্গাইল বন্ধুসভার বন্ধুগণ। জন্মদিনের কেকের উপর লেখা ছিল 'হ্যাপি বার্থডে তানিয়া আপা এন্ড বেবি'। মা খালার আদর সোহাগে লালিত হতে থাকলে তুমি। মা, খালামণির হাত ধরে একদিন তুমি চলে এলে বন্ধুসভায়। সেই থেকে তুমি বন্ধুসভার একজন নিয়মিত সদস্য হয়ে গেলে। বন্ধুসভার প্রতিটি অনুষ্ঠান মাতিয়ে রাখতে তুমি। আনন্দ পাঠ স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে তোমার মা আমাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন আমার ম্যাডাম, সালাম দাও। তুমি পদ্মফুলের মতো তোমার ডান হাত বিকশিত করে আমাকে সালাম দিলে। সেই দৃশ্য আমাকে আপণ্নুত করে। তুমি যতই বড় হতে থাকলে ততই সবার দৃষ্টিনন্দন হয়ে চঞ্চলতায় সবাইকে অবাক করে দিতে। মাতিয়ে রাখতে টাঙ্গাইল বন্ধুসভার বন্ধুদের। ছোট্ট বয়সেই তুমি নাচ-গান-আবৃত্তিতে সবার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলে। ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পেণ্ডতে তুমি পড়তে। তোমার অন্য বন্ধুদের চাইতে তুমি চঞ্চলতায় এগিয়ে ছিলে। সে চঞ্চলতর মধ্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত ছিলো। কিন্তু তুমি আজ নেই।

৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে ভয়াল মৃত্যু তোমাকে কেড়ে নিলো। রৌদ্র, তোমার ছোট্ট জামা-কাপড়, থালাবাসন, বল, পুতুল সবই আছে। শুধু তুমি নেই। তুমি চলে গেছো না ফেরার দেশে। মায়ের আকুল কান্না থেমে গেছে। চোখের পানি শুকিয়ে যাবে একদিন। কিন্তু মা তার অন্দড়র থেকে তোমার স্মৃতি কি ভুলতে পারবেন? মা যতদিন বেঁচে থাকবেন, তোমার শূন্যতা তাকে কষ্ট দিবে। তোমার ছোট্ট বালিশখানা বুকে জড়িয়ে রাত কাটাবেন। সন্দড়ান হারানোর বেদনা একমাত্র মা-ই আজীবন বয়ে বেড়াবেন।

আমার এক দাদি প্রৌঢ় বৃদ্ধা-পুকুরঘাটে গোসল করতে গিয়ে শরীর মাজতেন আর গুনগুন করে করর্ণ সুরে গাইতেন-

পুত্রশোক বড় শোক কলিজা হয় কালা

আর কেহ না দেখিলে দেখে খোদাতায়ালা।

আমাদের কাছে বলতেন- বৌ কালেই তার একমাত্র পুত্রকে হারিয়ে তিনি আজও শোকসাগরে ভাসছেন।

সৃষ্টি ও ধ্বংস নিয়তির খেলা। পৃথিবী তার সৃষ্টিকে আপন ক্রোড়ে আলিঙ্গনে জড়িয়ে রাখতে চায়। কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের কাছে তাঁকে হার মানতে হয়। কোনো কিছুই অমর থাকে না।

কবির ভাষায়,

আঁধারের গ্রাস হতে কে টানিছে তারে
কহিতেছে শতবার 'যেতে দিব নারে'।
এ অনন্দড় স্বর্গমর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা; সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন 'যেতে নাহি দিব'। হায়
তবুও যেতে দিতে হয়, তবুও চলে যায়।

রৌদ্র, তোমাকে আমরা শত মায়ার বাঁধনে ধরে রাখতে পারিনি। আমাদের মর্মকে স্পর্শ করে চলে গেছো। তোমার খেলার বন্ধুরা তোমাকে ডাকে না। স্কুলের মিস তোমার নাম ডাকেন না। স্কুলের বন্ধুরা নতুন বন্ধু পেয়ে তোমাকে ক্ষণিকের জন্য স্মরণ করবে, রৌদ্র নামে আমাদের এক বন্ধু ছিলো। তুমি আকাশের গায়ে জ্বলজ্বল তারা হয়ে ফুটে আছো। তোমাকে ধরা বা ছোঁয়া যাবে না। কিন্তু বন্ধুসভার প্রতিটি বন্ধু, আনন্দপাঠের বন্ধুরা, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের বন্ধু, শিক্ষক, প্রতিবেশী বন্ধু ও স্বজনের মনের মাঝে তুমি ছায়া হয়ে থাকবে। চঞ্চলমতি দুরন্দড় যে ছেলেটি সবাইকে কবিতা গানে, আবৃত্তিতে, নাচে অনাবিল আনন্দে ভরিয়ে তুলতো, সে আর কাউকে কোনোদিন আকর্ষণ করবে না। বন্ধুসভার বন্ধুরা তোমাকে স্মরণ করে বলবে- রৌদ্রটা থাকলে কতই না আনন্দ হতো। মা তোমার বন্ধুদের মাঝে তোমাকে কল্পনা করে আবেগে চোখের জল ফেলবেন। সন্দড়ান বিয়োগের মর্মান্দিড়ক বেদনা একমাত্র মা-ই আজীবন অনুভব করবেন।

মরণ চিরন্দড়ন সত্য। নিষ্ঠুর নিয়তির হাত থেকে কেউ রেহাই পাবে না। কিন্তু তোমার চলে যাওয়া আমাদের অন্দড়র স্পর্শ করেছে। জীবনের নিশ্চিত পরিণতির কথা চিন্দড়া করে আমাদের ধৈর্য ধরতে হয়। পরম করর্ণাময়ের কাছে প্রার্থনা

করি, তিনি যেন তোমাকে জান্নাতী গেলমানের সাথে স্থান করে দেন। সেখানে ফুল বাগানে তুমি হাসবে, খেলবে, গাইবে। তোমার মাকে যেন আলণ্ডাহ সন্ড়ান হারানোর ব্যথা ভুলিয়ে দেন। পৃথিবীর সকল শিশুর মা হয়ে বেঁচে থাকুক তোমার মা, 'জিনিয়া বখ্শ'।

সেদিনের মেলা

শিশুকালের আনন্দমুখর দিন, কৈশোরের কোলাহল, ছাত্রজীবনের আনন্দঘন পরিবেশকে কেউ ভুলতে পারে না। হেমন্ড়ে পাকা ধান কাটার মাঠে খড়ের বল নিয়ে খেলা, নাড়ার আগুনে কলুই পোড়া খাওয়া, শীতে উদাম গায়ে নাড়ার আগুন পোহানো- এর মজাই আলাদা। আজকের দিনের মতো সেদিন আনন্দ উপভোগের এতো উপকরণ না থাকলেও গ্রাম্য পরিসরে আনন্দ উপভোগের মাত্রার কমতি ছিলো না। আমাদের দেশে বারো মাসে তেরো পার্বণ। দুটি ঈদ যেমন খুশি বয়ে আনে; তেমনি হিন্দুদের পূজা-পার্বণে বাড়তি আনন্দ উৎসব বয়ে আনে সবার মনে। পার্থক্য সময়ের তফাতে ঈদ ও পূজা-পার্বণে আনন্দের অতিরিক্ত মাত্রা যোগ হয়েছে।

এখন আমার সেই ছোটবেলার চৈত্রসংক্রান্ড়ি দোলযাত্রা, সরস্বতী পূজার কথা মনে পড়ে। হিন্দু সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠান চৈত্রসংক্রান্ড়ি, সংযাত্রা আর দোল পূজা দেখার জন্য গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে বেড়াতাম। সং -এর দিনে ছেলেরা বৌ সেজে গানের সাথে সাথে ছন্দে ছন্দে নেচে বেড়াতো। কী সুন্দর উপভোগ্য একটা অনুষ্ঠান উপহার দিতো! হিন্দু বৌয়েরা ঘটা করে এ উৎসব পালন করতো। আমার খুব মনে পড়ে রামদয়াল পেয়াদার কথা। ওকে দেখে ভয় পেতাম। সে বাৎসরিক খাজনার জন্য চৈত্র মাসে ঘনঘন গৃহস্থের বাড়িতে হানা দিতো। বৌ-ঝিরা তার ভয়ে আড়ালে চলে যেতো। খাজনা দিতে না পারলে হালের গরু্তে হাত দিতো। বৌ-ঝিদের গায়ের গহনা খুলে নেবার হুমকি দিতো। কথায় বলে না "রাজা যত নাহি কহেন পারিষদগণে কহেন ততগুণ।" এ সময় কাজ-কর্ম থাকে না। কৃষক অলসভাবে সময় কাটায়। খাজনা দিবার ভয়ে লুকিয়ে থাকে। দুর্ভিক্ষ আর খরার মাস চৈত্র মাস। এরমধ্যেও আনন্দ উৎসব যেন থেমে নেই। পেয়াদার ঢোলের সতর্কবাণী উপেক্ষা করে তখন সংক্রান্ড়ির উৎসব বড় করে দেখা দিতো। হিন্দু-মুসলমান আপামর জনতা আগে যেমন এই উৎসব উপভোগ

করতো, এখনও তেমনি আনন্দ উপভোগ করে।

পঞ্চাশের দশকেও গোল ছিদ্রওয়ালা এক পয়সা, চারকোণা বিশিষ্ট দুই পয়সা ও চার পয়সার প্রচলন ছিলো। ছিদ্রওয়ালা চারটি এক পয়সায় একআনা হতো। তখন একটাকার অনেক দাম ছিলো। আমরা একপয়সা দিয়ে একটি আলতার গুটি কিনতাম। দু পয়সায় চারগাছি রেশমি চুড়ি মেলা থেকে কিনতাম। মাটির ঘোড়া, তিলের নাড়ু, শোলার পাখি, টিনের পাখি চার আনায় দুহাত ভরে কিনে খুশি মনে বাড়ি ফিরতাম। এখনকার মতো এতো শত টাকা মেলায় খরচ করার মতো সামর্থ্য সবার ছিলো না। সমর্থ যারা, তারাই বেশি বেশি কেনাকাটা করতো। কোনো কোনো ছোটশিশু বাবার কাঁধে বসে, মায়ের হাত ধরে মেলার বাহারি আয়োজন দেখেই মজা উপভাগ করতো।

চৈত্র সংক্রান্ড়িতে চলতো চড়কপূজা, সংকীর্তনে হিন্দু ছেলেরা বৌ, রাজা-রাণী সেজে নাচতো-গাইতো। দলের সাথে আমরা ছোটরা দূর গাঁয়ে চলে যেতাম। এছাড়া মেলায় পুঁথি পড়া, লাঠিখেলা, পালাগান, রূপবান যাত্রার আসর বসতো। চৈত্রসংক্রান্ড়িতে বড় একটা আয়োজন ছিলো বৌ-নাচুনি খেলা। জোছনারাতে বসতো পুঁথি পড়ার আসর। বাড়ির বৌ-ঝিরা দেউড়িবেড়ার আড়াল থেকে বেড়ার ফাঁক দিয়ে পুঁথি পড়া শুনে মজা পেতো, আনন্দ উপভোগ করতো। বিরহে আবেগে কান্না করতো। ভেলুয়ার পুঁথির কয়টি পংক্তি:

সাত ভাইয়ের বইন ভেলুয়া জল ভরিতে আসে
সন্ধ্যাবেলা নামবো যাইয়া একলা জলের ঘাটে
কাঁখের কলসি ভূমিত থুইয়া ভেলুয়া সুন্দরী
নামিল জলের ঘাটে অতি তাড়াতাড়ি।।
একবার নামে কন্যা আরবার চায়
সুন্দর পুরু্ষ এক অদূরে ঘুমায়।
সন্ধ্যা মিলাইয়া...............।

গ্রামীণ জীবনের বিভিন্ন ঘটনার প্রকাশ লোককথা ও পুঁথি পাঠ, গান ও নাচের মাধ্যমে রঙ্গরসিকতা বাংলার ঐতিহ্যের সুর ও বাণীর মাধ্যমে প্রকাশ করে অনাবিল আনন্দ উপহার দিতো। আধুনিকতা ও যান্ত্রিক যুগে এখন এ সবের মাত্রা কমে এসেছে। সাড়ম্বর আয়োজন ও আধুনিকতায় গ্রামীণ জীবনের সেই আনন্দমুখর পরিবেশ আর নেই।

আমরা যারা প্রাক-পাকিস্ড়ান আমলে বেড়ে ওঠেছি, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দেশে হিন্দুরা স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চা ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের সুযোগ পেতো। এখন নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে দোল পূজা, আড়ং, বৈশাখী মেলা, সরস্বতী পূজা ও লক্ষ্মী পূজা পালিত হয়। আনন্দের চেয়ে উৎকণ্ঠার পাল্লা ভারী হয় বেশি, তবুও থেমে নেই আনন্দ উদযাপনের ধুম।

বছরের শেষদিন চৈত্রসংক্রান্ড়ি হতো। ঢোল ও হারমোনিয়ামের বাজনার সাথে চলতো নানা ঢংয়ে নাচগান। ভেলুয়া, বেহুলার পালা চলতো। সুন্দর কিশোর-যুবক বণ্ডাউজ পেটিকোট পরে মুখে পাউডার মেখে আলতা লাগিয়ে বৌ সাজতো। বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাচগান করে চাল, ডাল, টাকা পয়সা সংগ্রহ করতো। সঙ দেখার আনন্দই আলাদা। সঙের দলের সাথে আমরা ছোটরা এক গাঁও থেকে অন্য গাঁয়ে চলে যেতাম। যেন সঙ দেখার তামাশা ও মজা আর ফুরায় না। আমাদের ছোটবেলার মেলা এখনকার মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিলো না। কিন্তু আনন্দময় ছিলো। এখন মেলার পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। আনন্দের মাত্রাও বেড়েছে। নাতি-নাতনিরা কেউ কেউ মেলায় কদাচিৎ যায়, কেউ ঘরে বসে টেলিভিশনে মেলা দেখেই আনন্দ পায়।

তখনকার দিনে খোলামাঠে বড় বড় বটগাছের নীচে অনেক এলাকা জুড়ে মেলা বসতো। মেলার স্থান জুড়ে বসতো বিভিন্ন দোকান। মাটির হাঁড়ি পাতিল, কাঠের তৈজসপত্র, গৃহস্থালির সরঞ্জাম, মাটির খেলনা, ঘোড়া, হাতি, পুতুল, ডুগডুগি, টিনের পুতুল, শোলার পাখি, বাঁশের বাঁশি, ছাঁচের চিনিসাজ, বিন্নির খই, গজা-জিলাপি, তিলের নাড়ু, খৈয়ের মোয়ার বাহারি বেসাত। মেলার অন্যতম আকর্ষণ ছিলো পুতুলনাচ, নাগরদোলা, বানরনাচ, সার্কাস, ম্যাজিক, যাত্রা, থিয়েটার বেহুলার পালা ও রূপবান যাত্রার কদর ছিলো বেশী। এটা শ্রমজীবী মানুষের জন্য বড় আকর্ষণ ছিলো। সাংসারিক কাজের ঝামেলা মুক্ত হয়ে শ্রমজীবী মানুষ, গৃহবধূরা বিনোদনের জন্য এসব পালা দেখতো।

মেলার আকর্ষণীয় দিক ছিলো লালনগীতি ও বাউল সঙ্গীত। মেলার একপ্রান্ড়ে চলতো বাউল সাধক লালনের গান। দোতারা হাতে, গলায় কাঠের মালা, হলুদ পাঞ্জাবি, লুঙ্গি পরে বাউলশিল্পীর গানের সাথে অঙ্গভঙ্গি সবার মন কেড়ে নিতো।

'লালনের এসব দেখি কানার হাটবাজার, সত্য বল, সুপথে চল ওরে আমার মন, সময় গেলে সাধন হবে না, মিলন হবে কত দিনে, বাড়ির পাশে আরশিনগর'-

এসব গান আগের মতোই এখনো শ্রোতাকে আকর্ষণ করে। গায়কের গায়কি

ভঙ্গিতে শ্রোতা-দর্শকের আবেগ ও কান্না এক সাথে গেঁথে যেতো। এখনও মেলায় এসব গান হয়; কিন্তু আধুনিক যান্ত্রিক বাদ্যবাজনার ঝংকারে আড়াল হয়ে যায় গায়কের কণ্ঠের মধুরতা। চৈত্রের উদাস দুপুরে ভাটিয়ালি, মহুয়া-মলুয়ার পালাগান শুনলে মনটা ভরে যায়। যান্ত্রিকতার যুগে ইট-পাটকেলের ঘরে বসেই এখন আমরা চৈত্র সংক্রান্ড়ির আনন্দ উপভোগ করি। ঘরে বসে এসো ‘হে বৈশাখ’ অনুষ্ঠানটি টেলিভিশনে দেখি।

ইলিশ পান্ড়া শুটকি ভর্তা খাওয়া সময়ের দাবি রাখে। বাসন্ড়ী রঙের শাড়ি, লাল পেড়ে বৈশাখী শাড়ি, ধুতি পাঞ্জাবি একদিনের জন্য হলেও রেওয়াজ হয়ে গেছে। ঈদ উৎসবের মতোই শহর-নগরে শুভ নববর্ষ জানিয়ে বর্ষবরণ উৎসবে মেতে ওঠে সবাই। মেলার একপ্রান্ড় থেকে ভেসে আসে গান–

একদিন বাঙালি ছিলামরে
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান
মিলিয়া বাউলা গান আর মুর্শিদি গাইতাম
আগে কি সুন্দর ....।

বাৎসরিক খাজনা আদায়ের জন্য যেমন রাজপেয়াদা ঢোল বাজিয়ে সংকেত দিতো, তেমনি ব্যবসায়ীরা হালখাতা খুলে বসেন। গ্রাহকদের দাওয়াত করে বাড়ি বাড়ি দাওয়াত কার্ড বিলি করেন। মিঠাই ম—া, সন্দেশ দিয়ে আন্ড়রিকতার সাথে আপ্যায়ন করেন। এতে উভয়ের মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এটা বাঙালির চিরায়ত অনুষ্ঠান।

আজ চৈত্রের শেষ দিন। শৈশবের সেই কোলাহলময় দিনগুলো স্মৃতিপটে ভেসে আসে। সেই দিনগুলো আবার কাছে পেতে ইচ্ছে করে। চৈত্রের বিদায়, ঢোল মাদলের তালে তালে নববর্ষ দ্বারে। কিন্তু শৈশবের সেই চঞ্চলতা নেই। আছে শুধু স্মৃতি রোমন্থন।

আমার মা

মা কথাটি মিষ্টি অতি মধুর সমান
কহিতে শুনিলে কথা জুড়ায় পরান।

মা আমাদের ছেড়ে এ পৃথিবী থেকে চলে গিয়েছো অনেক বছর হলো। তোমাকে ভুলতে পারিনি, ভুলা যায় না। ১৩ এপ্রিল বিশ্ব মা দিবস। তোমাকে স্মরণ করতে মা দিবসের প্রয়োজন হয় না। সংসারের আবিলতার জটিল সন্ধিক্ষণে তোমাকে বেশি বেশি মনে পড়ে। ওমা, প্রতি মুহূর্তে তোমাকে মনে পড়ে। আমাকে নিয়ে তোমার মনের বাসনা ও তৃপ্তি সবকিছু মিলে তুমি আনন্দ-উপভোগ করতে, গর্ব করতে। লেখাপড়া শেষে চাকরি পেলাম। তোমার ও বাবার সে কী আনন্দ! তোমরা এখন কেউ জীবিত নেই। বাড়ি গেলে কবরস্থানে যাই। চোখের জলে তোমাকে স্মরণ করি। তুমি শুয়ে আছো মাটির বিছানায় অনন্ড়কালের সাক্ষী হয়ে। সেখানে সকালের সোনালি নীলিমায় হালকা বাতাস দোল খায়। গাছের শীতল ছায়ায় তুমি শুয়ে আছো। সেখানে শিউলি ফুল, রজনীগন্ধা, মাধবীলতা নেই। নাম না জানা ঘাসফুল ও দুর্বাঘাসের কার্পেটে ঢাকা তোমার মাটির ঘর। সেখানে দখিনা বাতাস তোমাকে পরম শান্ড়িতে ঘুম পাড়ায়। পাশে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী বালক-কিশোর আলেমগণ প্রতিদিন পাঁচবার তোমার আত্মার শান্ড়ি ও মাগফিরাত কামনা করে। আলণ্ডাহ তোমাকে ও সকল কবরবাসীকে জান্নাতবাসী কর—ন।

মা, তোমার মতো আমিও এখন নাতি-নাতনির দাদি-নানি হয়েছি। ছেলে-বৌ পরিবেষ্টিত সংসার। প্রতিমুহূর্তে কঠিন বাস্ড়বতার যখন সম্মুখীন হই, তখন

তোমাকে বেশি বেশি মনে পড়ে। সংসারের জটিলতা, নানা সমস্যা বিচক্ষণতার সাথে তুমি সামাল দিতে। তোমার সেই সময়ের অবস্থার কথা মনে করে আমি সব ভুলে যাই। আমাদের লেখাপড়ার প্রতি তোমার খুব নজর থাকতো।

ভাইয়েরা বাংলাদেশের বিভিন্ন কলেজে পড়াশুনা করতো। ছুটিতে এলে বা টাকা চেয়ে পত্র দিলে তুমি ও বাবা দুশ্চিন্ড়ায় পড়ে যেতে- কিভাবে টাকার সংস্থান হবে এ নিয়ে। সামান্য বেতনের হাইস্কুলের মৌলবী শিক্ষক আমার বাবা বলতেন- খোকার মা, এ মাসেও বেতন হবে না। তখন তুমি এখানে-ওখানে গুঁজে রাখা টাকা বের করতে, আর বাবার সঞ্চয়ের টাকা দুজনে মিলে হিসাব করতে কত টাকা হলো। পরম তৃপ্তিতে তোমরা সেই টাকা ছেলেদের হাতে তুলে দিয়ে শান্ড়ি পেতে। ভাইয়েরা ছুটি শেষে যাওয়ার দিন তোমার রাতে ঘুম হতো না। কি শীত কি গ্রীষ্ম ভোরবেলায় ওঠে তুমি রান্না করতে। পড়ার টেবিলে ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দিতে। কে কখন খেতে আসবে অপেক্ষায় বসে থাকতে। মা, এখন আমিও তোমার মতো এই দায়িত্ব পালন করছি।

তোমার হাতের সব রান্নাই মজা হতো। আমাদের দুধালো গাভী ছিলো। বাবা দুধ দোহন করতেন। সেই দুধ দিয়ে তোমার রান্না করা গুড়ের ক্ষীর খুব মজা করে খেয়েছি। এখন অনেক ক্ষীর পায়েস রান্না করা হয়। তোমার রান্না সেই ক্ষীরের মতো স্বাদ আর হয় না। তুমি সবসময়ই হাতে কাটা সেমাই, চালের গুড়া, গুড় লুকিয়ে রেখে দিতে। মেহমান এলে তাড়াতাড়ি পিঠা পায়েস তৈরি করে দিতে। মেহমানদারি করতে তুমি কখনো বিরক্ত হতে না। আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী সবাই তোমার ব্যবহারে মুগ্ধ ছিলো। সংসারের চাপে যখন তুমি খুব পেরেশান হতে- এক ফাঁকে পানের ডালা নিয়ে বসতে। প্রতিবেশী মহিলাদের সাথে সুখ-দুঃখের আলাপ করতে। নানাবাড়ির গল্প করতে। গাছের কলা ও আম দিয়ে এ বাড়ির ও বাড়ির মহিলাদের আপ্যায়ন করতে। কোনো ফকির ও সওয়ালীকে তুমি বঞ্চিত করতে না।

বড় দুই বোনের বিয়ের পর আমিই তোমার কাছে ছিলাম। আমার লেখাপড়ার প্রতি তোমার খুব নজর ছিলো। আমি ময়মনসিংহ মুসলিম গার্লস হাইস্কুলে পড়ার সুবাদে মিয়াভাইর বাসায় থাকতাম। আমার পরীক্ষার সময় হলে তুমি ময়মনসিংহ চলে যেতে। পরীক্ষার ফলাফল নিয়েও তুমি খুব চিন্ড়িত থাকতে। ভাইদের বৌ নির্বাচনে বাবার ভূমিকা ছিল বড়। মেয়েদের পাত্র নির্বাচনে তোমার ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। সংসারের জটিল সমস্যাগুলো তুমিই সমাধান

করতে। আমার বিএড ট্রেনিংএর সময় তুমি খুব কষ্ট করেছো। তখন আমি তিন সন্ড়ানের জননী। শিউলি, সোহেল, সুমনকে তোমার কাছেই রাখতে। তোমার সেই সময়কার কষ্টের কথা আমি ভুলতে পারি না। তুমি আমার মা বলেই

আমার ছেলেমেয়েকে যত্নের সাথে লালনপালন করেছো। মাঝেমধ্যে আমার সংসারের দায়িত্বও পালন করেছো। তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। তোমার জন্য কিছুই করতে পারিনি। আমার ভালো লাগা ও আমাকে ভালবাসার মানুষ আমার শ্বশুর-শাশুড়ি, বাবা-মা তোমরা কেউ জীবিত নেই। কিন্তু তোমাদের শূন্যতা সবসময়ই উপলব্ধি করি। সংসারের নানা জটিলতায় তোমাদের সেই প্রিয় মুখগুলো স্মরণ করি। আমরা ভাইবোনেরা এখন জমজমাট সংসারী। তোমার চাওয়া ও না পাওয়ার বিষয়গুলো এখন গভীরভাবে আমার হৃদয়ে রেখাপাত করে। এখন প্রতিপদেই তোমার ইচ্ছা ও আমার ইচ্ছার সাথে মিলিয়ে দেখি। সংসারের জটিল সমস্যাগুলো তুমি হালকাভাবে নিতে। আমিও চেষ্টা করি। জগৎ সংসারটাই হয়তো মায়েদের জন্য এমনই। তুমি ওপার থেকে আমার জন্য দোয়া করো।

সাত সন্ড়ানের জননী তুমি। সংসার পরিচালনায় তোমাকে হিমশিম খেতে হয়েছে। নানা জটিল সমস্যায় তোমাকে বিমর্ষ দেখেছি। ভাইদের লেখাপড়ার খরচ যোগানো আমার মৌলবী শিক্ষক বাবার পক্ষে কষ্ট হতো। সংসারের আয়ও তেমন ছিলো না। তবুও তোমাকে কখনো হতাশ হতে দেখিনি। তোমাকে অনেক দুঃসময়ের মুখোমুখি হতে দেখেছি; কিন্তু হাল ছাড়তে দেখিনি। অনাগত আশার আলো নিয়ে তুমি তোমার সন্ড়ানদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছো। লেখাপড়ার খরচ যুগিয়েছো। তোমার চোখের আলোয় অনেক পাওয়ার আশা ছিল। সত্যিই কি মা, তুমি যা চেয়েছিলে তা পেয়েছো? তোমার ছেলেরা যথাযোগ্য সম্মানের চাকরিজীবী ছিলো। নাতি-নাতনিরাও অনেক বিদ্বান হয়েছে। তারা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি-বেসরকারি চাকরি করে; কেউ বা বিদেশে আছে। কালে-ভদ্রে কারও সাথে তেমন সাক্ষাৎ হয় না, ফোনে মাঝেমধ্যে কুশল বিনিময় হয়। ভাইয়েরা যখন পড়াশুনা করতো, বিভিন্ন স্থানে থাকতো, তুমি কত যত্ন করে পত্র লিখতে। তোমার পত্র লেখার টাইম ছিল ফজর ও আসরের নামাযের পর। ঘরে খিড়কি দরজা খুলে নীরবে বসে তুমি মনের আবেগে পত্র লিখতে। পত্রের উত্তরের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে। বেশি দেরি হলে বাবাকে পোস্টঅফিসে খোঁজ নিতে তাগিদ দিতে। অনেক সময় দেরিতে হলেও উত্তর আসতো। আবার কখনো উত্তর আসতো না।

এ নিয়ে তোমার চাপা কষ্ট ছিলো। নানা কারণে তোমার জীবনের সেই চাপা কষ্ট আমার জীবনে খুব বুঝতে পারি।

আমার প্রয়োজনেই তুমি আমার কাছে আসতে। আমার ছেলেমেয়েদের দেখভাল করার জন্য তুমি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছো। ওরা এখন বড় হয়েছে। সংসারী হয়েছে। ওরা কি কখনো নানিকে মনে করে? মা, শেষবার যখন তুমি টাঙ্গাইল হতে চলে যাও, আমি তোমাকে মেজোভাবীর সাথে বাসে তুলে দিলাম। সেদিন আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কেঁদেছিলে। আর তোমার টাঙ্গাইল আসা হয়নি। দীর্ঘসময় প্যারালাইজড হয়ে বিছানায় আশ্রয় নিলে। তোমার ছেলের বৌ মেজোভাবী ও নাজমা তোমাকে খুব যত্ন করতো। বড়ভাবী সেজোভাবী দূরে থাকতেন। মেজোভাবী ও ছোট বৌ নাজমা তাদের সন্ড়ানের মতো তোমাকে প্রতিপালন করেছে। তাদের সেবা-যত্ন, তোমার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ দেখে আমরা মেয়েরা তাদের নিকট আন্ড়রিকভাবে কৃতজ্ঞ। আলণ্ঢাহর কাছে প্রার্থনা করি, তোমাকে ও তাদেরকে আলণ্ঢাহ মহব্বতের সাথে হেফাজত কর্ন্দন।

মা, সংসার জীবনে তোমার চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে অনেক ব্যবধান ছিল। কিন্তু তুমি প্রকাশ করতে কম। সংসারের জটিল সমস্যাগুলো তুমি নীরবে সহ্য করতে। তোমার মলিন ও চিন্ড়াগ্রস্ড় চেহারা দেখে আমি বুঝতে পারতাম তুমি কত অসহায়। কিন্তু সেই অসহায়ত্বের কাছে তুমি কখনো আত্মসমর্পণ করোনি। তুমি স্বাভাবিক হয়ে থাকার চেষ্টা করতে। এটা তোমার বড় গুণ ছিলো। মা, আমি তোমার মতো হতে পারিনি। জীবনের শেষপ্রান্ড়ে দাঁড়িয়ে অসহায় নাবিকের মতো ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করতে নিজেকে অনাথ মনে হচ্ছে। অনেক দিন তোমাকে মা বলে ডাকি না, ডাকতে ইচ্ছে করছে।

মা ডাকের সাথে যে মধুরতা জড়িয়ে আছে, পৃথিবীর অন্য কোনো শব্দের সাথে তার তুলনা হয় না। মা ডাকের সাথে যে প্রশান্ড়ি লুকিয়ে থাকে, তা মা-ই বুঝতে পারে। তাই তোমাকে পরান ভরে মা মা বলে গভীরভাবে ডাকতে ইচেছ করছে। মা, তুমি কি এতোদিন পর আমার ডাক শুনতে পাবে? সেদিন মধুপুর যাওয়ার পথে অবিকল তোমার চেহারার এক বৃদ্ধ মাকে দেখে আমার কান্না পেলো। আমার ভুলে যাওয়া মায়ের কায়া ঐ বৃদ্ধ মায়ের মধ্যে আমি খুঁজে পেয়েছি। আর নতুন করে তোমার ছবিটা আমার মানসপটে এঁকে নিয়েছি। তোমার হাসিমাখা, পান খাওয়া রাঙা মুখখানি আমি কল্পনায় নতুন করে আমার মনের মাঝে সাজিয়ে রাখবো যত দিন বেঁচে আছি।

গ্রামের নতুন একটি গোরস্থানে তুমি সমাহিত হয়েছো। এখন গোরস্থানটি পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। পরিচর্যার অভাবে বেড়ে ওঠা কাশফুল গাছে ফুল ফোটে। শন আর কাশের গাছ বাতাসে দোল খায়। নাম না জানা ঘাসফুল আর দুর্বাঘাস গালিচার মত বিছিয়ে আছে তোমার কবর গায়ে। সংসার ও পৃথিবীর বেড়াজাল থেকে মুক্ত তুমি। আলণ্ঢাহ তোমাকে পরকালে শান্ড়ি ও সর্বশ্রেষ্ঠ জান্নাত দান কর্ন্দন- এই কামনা করি।

“আল জান্নাতু তাহতিহাল উম্মেল হাত” মা তোমার পায়ের নীচেই আমার বেহেশত। আমি তোমার সেবা-যত্ন করার সুযোগ পাইনি। ছাত্রী অবস্থায় সংসার, বাচ্চা প্রতিপালন, তারপর চাকরি নিয়েই ব্যস্ড় থাকতাম। বরং আমি স্কুল থেকে ফিরলে তুমিই ব্যস্ড় হতে আমাকে নিয়ে। বাচ্চারা স্বভাবসুলভ মতোই আমার কাছে ছুটে আসতো। তুমি তোমার মেয়ের রেস্টের কথা চিন্ড়া করে ওদের খেলায় পাঠিয়ে দিতে। তোমার নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও ¯েœহ থেকে বঞ্চিত আমি দীর্ঘদিন। এখন সংসারের আবিলতায় সুখে-দুঃখে তোমাকে স্মরণ করে নীরবে নিভৃতে চোখের জল ফেলি।

আমার ভালোলাগা ও ভালোবাসার মানুষ আমার মা। হে আলণ্ঢাহ, আমি আমার মাকে যে রূপ ভালবাসি, তুমি তার চাইতে অনেক বেশি ভালোবাসার সাথে, রহমতের সাথে গ্রহণ করো। পূণ্যবান ও বেহেশতবাসী রমণীর সাথে আমার মাকে হাশর নসিব করো। তোমার প্রশংসিত জান্নাতে আমার মাকে স্থান দিও।

আমার কর্মজীবনে
টাংগাইল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়

জীবন গতিময়, প্রবহমান। গতিময় জীবনের শিশুকাল, কৈশোরকাল, যৌবনকাল পেরিয়ে লেখাপড়ার অধ্যায় সমাপ্ত করে কর্মময় জীবনের শুর“। সেই জীবনের পরিসমাপ্তি টেনে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে চলার পথের কিছু কথা মানসপটে উঁকি দেয়। প্রত্যেক মানুষের কর্মজীবন বাছাই করার প্রবণতা থাকে। শিক্ষাজীবনে কোনো পেশা আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেনি। তবে শিক্ষকতা পেশা আমার ভালো লাগতো একটি কারণে। আমার বাবা ছিলেন সাধুটি নজীব উদ্দিন জুনিয়র হাইস্কুলের মৌলবী শিক্ষক। বাবার সাথে কোথাও বেড়াতে গেলে আধঘণ্টার রাস্ড়া একঘণ্টা লেগে যেতো। বাবার অনেক নতুন ও প্রাক্তন ছাত্র ছিলো, তাদের সাথে রাস্ড়া-ঘাটে দেখা হলে বিনম্র সালাম, কুশল বিনিময়, পারিবারিক খোঁজ-খবর নেয়া-এসব করতেই অনেক সময় পার হয়ে যেতো। আমার স্বামী মো. ছাদের আলী মিয়া, প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বি.বি. সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয় এবং জেলা শিক্ষা অফিসার হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁর আন্ড়রিক সহযোগিতায় তিন সন্ড়ানের জননী হয়েও লেখাপড়ার সুযোগ পেয়েছি। হোস্টেলে থেকে বিএড ট্রেনিং করার সুযোগ পেয়েছি।

১৯৭৩-৭৪ খ্রিষ্টাব্দে যখন ময়মনসিংহ বিএড মহিলা টিচার্স ট্রেনিংয়ে ভর্তি হই, তখন দৈবক্রমে টাঙ্গাইল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রিজিয়া সালামের সাথে একই র“মে থাকার সুযোগ পাই। ট্রেনিং-এর ব্যস্ড়তার ফাঁকে আপা অনেক সময় স্কুল সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। ট্রেনিং শেষের দিকে আপা একদিন বললেন, আমার স্কুলে কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ

দেয়া হবে, দরখাস্ড় করে দেখতে পারো। রিজিয়া সালাম ট্রেনিং শেষে বিদ্যালয়ে যোগদান করলেন। যথারীতি সার্কুলার হলে আমি দরখাস্ড় করলাম। তিন মাস অনারারি সার্ভিসের পর আমি ও মজিবর রহমান স্কুল ম্যানেজিং কমিটির বিবেচনায় নিয়োগপত্র পেলাম। এ সময় স্কুলের শিক্ষক প্রতিনিধি ছিলেন, বিজ্ঞান শিক্ষক আরিফুর রহমান ও মৌলবী শিক্ষক আব্দুর রহমান। আমি কৃতজ্ঞ প্রধান শিক্ষিকা বড় আপা শ্রদ্ধেয় রিজিয়া সালাম ও তৎকালীন স্কুল কমিটির নিকট।

১৫ জুন ১৯৭৫ আমার শিক্ষকতা পেশার প্রথম দিন। আমি সহকর্মী শিক্ষক হিসাবে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষকদের সান্নিধ্য পেলাম। এই পরিবারের একজন সদস্য হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হলো। প্রথম দিন প্রেয়ার লাইনে দাঁড়ালাম। সারিবদ্ধভাবে শিক্ষক-কর্মচারীদের সম্মুখে শ্রেণিভিত্তিক লাইনে সুশৃঙ্খলভাবে একসমুদ্র ছাত্রী দাঁড়িয়ে আছে নীল-সাদা ড্রেস পরে। সম্মুখে উর্ধ্ব আকাশে লাল-সবুজে আঁকা আমাদের গৌরব দেশের পতাকা পতপত করে উড়ছে। এখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুব ধন্য মনে হলো। একজন ছাত্রী-নেত্রীর কোরআন তেলাওয়াত ও শপথ পাঠের মধ্য দিয়ে শরীরচর্চা শিক্ষিকা জোহুরা আক্তারের তত্ত্বাবধানে প্রেয়ার লাইন শুর“ হলো। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানের সুর সমবেত ছাত্রীদের কণ্ঠলহরী দেশ-মাতৃকার প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদন সেদিন আমার মনকে আকৃষ্ট করেছিলো। এভাবেই আমার শিক্ষকতা জীবনের অধ্যায় শুর“ হলো। তখন বিদ্যালয়টিতে প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ড় চালু ছিলো। প্রাইমারি সেকশন পরে বন্ধ করে দেয়া হয়।

ট্রেনিং শেষে প্রধান শিক্ষিকা রিজিয়া সালাম বিদ্যালয়ে যোগদান করলে স্কুল কমিটির সাথে কোন্দল দেখা দেয়। জটিলতা বেড়ে যাওয়ায় কমিটির সিদ্ধান্ড়ে রিজিয়া সালাম সাসপেনশনে গেলেন। প্রধান শিক্ষিকা পুনর্বহালের জন্য সচেষ্ট

রইলেন। সে সময় বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন জিয়াউর রহমান। স্কুলে নতুন কমিটি, জেলা প্রশাসন ও প্রেসিডেন্টের হস্ড়ক্ষেপে, স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহায়তায় সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে রিজিয়া সালাম প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে পুনর্বহাল হলেন। দীর্ঘদিন সুনামের সাথে দায়িত্ব পালনের পর ২-২-০১ তারিখে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এরপর প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন সহপ্রধান শিক্ষিকা সেতারা বেগম। তিনি একজন দক্ষ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষিকা ছিলেন। সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন শেষে ১৭-১০-০২ তারিখে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এ সময় বিজ্ঞান শিক্ষক আমীর হামজা এক সুবর্ণ সুযোগে ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে সন্ড়োষ জাহ্নবী হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সাথে দায়িত্ব পালন শেষে তিনি অবসরে আছেন। বিজ্ঞান শিক্ষক আমির হামজা দীর্ঘদিন এ বিদ্যালয়ে শিক্ষক পরিষদের সেক্রেটারি দায়িত্ব পালন করেছেন। বাজেট প্রনয়ন ও অফিস সংক্রান্ড় কাজে তিনি দক্ষ ও অভিজ্ঞ ছিলেন।

মৌলবী সাহেব দায়িত্বরত অবস্থায় বেশ কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়। তারা হলেন রওশন আলী (বিজ্ঞান), আলাউদ্দিন (বিজ্ঞান), বজলুর রহমান (ইংরেজি), শাহ আলম তালুকদার (ইংরেজি) ও জাহাঙ্গীর হোসেন (বিজ্ঞান)। বিদ্যালয়ের ছাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় নতুন শাখা খোলার প্রয়োজনে খণ্ডকালীন নিয়োগ পান ফিরোজা খান, তাসরীন আক্তার রত্না ও আফরোজা বানু। মৌলবী আব্দুর রহমান দায়িত্ব পালন শেষে ৩১-১০-০৪ তারিখে অবসর গ্রহণ করেন। এরপর হাসান আলী ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। উনি ধরেরবাড়ী মুসলিম উচ্চবিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পেলে বিজ্ঞান শিক্ষিকা আসমা খাতুন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হাসান আলী একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ইংরেজি শিক্ষক। ধরেরবাড়ী হাইস্কুল থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ড্যাফোডিল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সুনামের সাথে কর্মরত আছেন। আসমা খাতুন ৩-৮-০৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ড় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ৪-৮-০৯ তারিখে তিনি পূর্ণাঙ্গ প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

আমি যখন বিদ্যালয়ে যোগদান করি ঐ সময় প্রায় ১৩ শত ছাত্রী ছিলো। ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ড় ২টি করে শাখা ছিলো। প্রতিদিন ৭/৮টি ক্লাস নিতে হতো। নতুন শিক্ষক ছিলাম বলেই নাকি ভালবেসেই বড় আপারা

স্টপগ্যাপের ক্লাসগুলো আমাকে দিতেন। বড় আপা রিজিয়া সালাম বলতেন, তোমার ক্লাশটা ম্যানেজ করে অমুক ক্লাসে লিখতে দিও। বড় আপার কোমল স্বভাব ও বিনয় আচরণে অবাধ্য হওয়ার সুযোগ ছিলো না। স্কুল জীবনে যাদের সাহচর্য পেয়েছি, তাদের কাছ থেকে অনেক শিখতে পেরেছি ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। সিনিয়র শিক্ষিকা জাহানারা আপার ব্যক্তিত্ব, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও রুচিশীল আচরণ আমার ভালো লাগতো। আমি উনার শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করতাম। বিদ্যালয়ে থাকাকালীন আমার বলা হয় নাই- আপা, আপনাকে আমি খুব পছন্দ করি। অবসর গ্রহণের পর আপা বড় মেয়ে ও ছোট ছেলের নিকট আমেরিকা চলে যান। কর্মজীবনে গুরু থেকে যাদের নিকট হতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি তারা অনেকেই ইহজগতে নেই। যাদের হারিয়েছি তারা হলেন, মজিবর রহমান, পণ্ডিত নৃপেন বাবু, আব্দুল হালিম (বিজ্ঞান), রাশেদা আক্তার, দিলরুবা খান মিনু, রোকেয়া খানম, পণ্ডিত বরুণ কুমার ও কমার্স শিক্ষক আব্দুর রহমান। আমার স্কুল জীবনের বান্ধবী রোকেয়া খানম পুষ্পকে আমি এই বিদ্যালয়ে সহকর্মী হিসাবে পেয়েছিলাম। সদা হাস্যময়ী রোকেয়ার সাথে আমার স্কুল জীবনের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সুঠাম দেহধারী বরুণ বাবুর সাথে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কাজ করেছি। ২/৩ দিনের জ্বরে তিনি অকালপ্রয়াত হলেন। বাবু ভারত বেড়াতে গেলে আমার জন্য ছোট্ট একটি গিফট আনতেন। সেই ছোট্ট বস্তুটি আমার নিকট অনেক মুল্যবান মনে হতো। বাবুর মৃত্যুর পর নরেশচন্দ্র পাল হিন্দুধর্মীয় শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পান। কমার্স শিক্ষক আব্দুর রহমান একজন মধ্যবয়সী সুস্থদেহী লোক ছিলেন। হঠাৎ করে কিডনি সমস্যায় আক্রান্ড় হয়ে ভারত-বাংলাদেশে চিকিৎসা নিলেন। জীবনযুদ্ধে হেরে গেলেন তিনি। পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নিলেন। চাকরি জীবনে যে সব শিক্ষককে হারিয়েছি এবং যারা অবসরে আছেন, তারা নিজ নিজ অবস্থানে দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক ছিলেন। ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাদের জীবনকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন। টাঙ্গাইল শহরে তাদের যথেষ্ট অবদান ও সুনাম রয়েছে। অবসরপ্রাপ্ত আরিফুর রহমান (বিজ্ঞান) বাৎসরিক বাজেট প্রণয়নে অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষক পরিষদের দায়িত্ব পালন করেন। এরপর এই কঠিন দায়িত্বটি অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ড় আমাকে পালন করতে হয়। প্রতিবেশী ফাতেমা রশিদ অসুস্থতার কারণে চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই অবসর গ্রহণ করেন। অবসরপ্রাপ্ত আবুবকর সাহেবের একটি সদগুণ হলো একটু সুস্থ বোধ হলেই আমাদের

দেখতে আসেন। কমার্স শিক্ষক (অব) খলিলুর রহমানকে আমরা বড় ভাই ডাকতাম। বিজ্ঞান শিক্ষক হালিম সাহেবের বড় ভাই ছিলেন তিনি। সেই হিসাবে আমরা তাকে যথেষ্ট সমীহ ও শ্রদ্ধা করতাম। খলিল সাহেব অনেক মজার গল্প ও কবিতা শোনাতেন। উনার আবৃত্তির কণ্ঠস্বরও ছিল ভালো। এই বয়সেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' মুখস্থ বলতে পারতেন। একবার পরীক্ষার হলে উনি আমাকে ২০ লাখ নেকীর একটি দোয়া লিখে দিলেন। দোয়াটি পড়তে গেলে উনার কথা মনে পড়ে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও মিলাদ মাহফিল এ বিদ্যালয়ের প্রধান আকর্ষণ। জাঁকজমকপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে ম্যানেজিং কমিটি, বরেণ্য ব্যক্তি ও অভিভাবকদের আগমনে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ মধুর মিলনমেলায় পরিণত হয়। বাৎসরিক মিলাদ মাহফিল আয়োজনে মৌলবী ওমর আলীর সাথে দীর্ঘদিন দায়িত্ব পালন করেছি। মৌলবী ওমর আলী আমার নিকট ভ্রাতৃতুল্য।

দীর্ঘদিন যাদের সাথে এক পরিবারের মতো কাটিয়েছি মাহমুদা খান, শুক্লাদি, মনোয়ারা খাতুন, জোহরা আক্তার, রাশিদা আক্তার চৌধুরী, রায়হানা বানু, শিপ্রা ঘোষ মৌ, ওমর আলী ও পূর্বে উলেণ্টখিত সকল শিক্ষকের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। মাহমুদা আপা ও শুক্লাদি অবসরে গেলে আমার মনটা শূন্যতায় ভরে যায়। ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার প্রতীক শুক্লাদির কর্মদক্ষতা আমাকে উৎসাহিত করতো। সহকর্মীদের নিকট যথেষ্ট ভালবাসা শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতা পেয়েছি। জীবনের পয়ত্রিশ বৎসর একসাথে কাটিয়েছি। সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা একে অন্যের সাথে শেয়ার করতে পেরেছি। তেমনি আনন্দঘন মুহূর্ত উদযাপন করেছি। পরিবারের সদস্যদের সাথে যে কথা বলা হয়নি, বন্ধুসুলভ সহকর্মীদের সাথে অবলীলায় তা বলে মনের আবেগ হালকা করেছি।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের অফিস সহকারী আব্দুল মালেক ও ছাদের হোসেন বিদ্যালয়ের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। বিশেষ করে আব্দুল মালেক একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারী। দীর্ঘদিন এখানে কর্মরত থাকায় প্রতিষ্ঠানের গুর‍ুত্বপূর্ণ কাজে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে আসছে। এছাড়া ইছহাক ভাই, আব্দুল হাই, কাশেম আলী স্ব স্ব অবস্থানে থেকে যথেষ্ট অবদান রাখছে। ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী মনসুর আলীর কথা খুবই মনে পড়ে। সদ্যমৃত কর্মচারী বেদানা বেগম আমার প্রতিবেশী ছিলো বলে ওর সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। দীর্ঘদিন একসাথে চাকরি করেছি, ছুটি শেষে একসাথে বাড়ি ফিরেছি। আমি অবসরে যাওয়ার পরও সে অভ্যাসবশত স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে আমার সাথে দেখা করতো। মৃত্যুর ২/৩

দিন পূর্বে আমাকে বললো- 'আপা, শরীরটা ভালো থাকে না, ২ বৎসর চাকরি আছে, হয়তো করতে পারবো না। সেই কথাই সত্য হলো। আমাদের বেদানা বেগম; প্রতিবেশীদের নিকট একজন সহজ সরল ও ধৈর্যশীলা মানুষ ছিলো। বিদ্যালয়ের কাজলীর মা (মৃত) দীর্ঘদিন এই প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করেছে। আমার পরিবারের সাথে তার একটা সুসম্পর্ক ছিল। তার গাছের আম কাঁঠাল আতাফল বরই আমাদের খাওয়াতো। এসব কথা এখন খুবই মনে পড়ে। যেকোনো প্রয়োজনে তাকে হাতের কাছে পেতাম। আলণ্ঢাহ সকল মৃত ব্যথিত আত্মাকে পরম শান্ড়ি দান কর‍ুন।

বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে নতুন ও পুরাতনের মিলনমেলায় শিক্ষাদান চলছে। অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষকদের নিকট থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণ করে স্কুল পরিবার ও সমাজের জন্য যথেষ্ট সুনাম বয়ে আনবে। 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' এই মূলমন্ত্র বক্ষে ধারণ করে এই প্রতিষ্ঠানের মেয়েরা বিভিন্ন পেশায় স্ব অবস্থানে উজ্জ্বল। তারা কেউ ডাক্তার, প্রফেসর, এডভোকেট ও সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে অবদান রাখছে। নার্সিং পেশায় আমাদের মেয়েরা যথেষ্ট সুনাম করছে। আশা করি, এই বিদ্যালয়ের মেয়েরা আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আদর্শ নারী, আদর্শ মা ও মহীয়সী নারী হিসাবে একদিন দেশ গড়ার কাজে নেতৃত্ব দিবে। একদিন এদেশের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-গরিমায় আদর্শ চরিত্রবান ও নীতিবোধে বলীয়ান হয়ে সুস্থ ও সুন্দর সমাজ গঠনে ভূমিকা রাখবে- এই প্রত্যাশা আমার।

সেই ১৫/৬/৭৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৩১/১২/১০ এই দীর্ঘ সময়ে অনেক ছাত্রীর সাহচর্যে কাটিয়েছি। অনেকের নাম স্মৃতির আড়ালে। এর মধ্যে হোসনেআরা বেবি, রেবেকা, শামীমা, পদ্মা সাহা, সানজিদা, বীথিকা, রীনা, বিউটি, কামর‍ুন্নাহার, স্বপ্না, আয়শা, ও তাহমিনা খান মিতু (প্রফেসর) যমজ বোন র‍ুমু-ঝুমু ও সাথী-বীথি, ণ্ণেহি, মম, জেমি, এ্যানি, মণিকা, শ্যামলী, শ্রাবন্ড়ী, মণি চৌধুরী, সোমাইয়া, ববী বাগচী, আজমেরী, অনন্যা, সূচনা, নোভা, হামিদা, নুপুর সাহা, নাসরীন মুন্নি- এদের কথা বেশ মনে থাকবে। বন্দনা মেয়েটির কষ্ট আমাকে খুব পীড়া দিতো। ও হাঁটতে পারতো না। ওর গার্জিয়ান না আসা পর্যন্ড় ছুটির পর আমি অপেক্ষা করতাম। নতুন-পুরাতন ছাত্রীদের হাসি উজ্জ্বল মুখ আমার মানসপটে আঁকা থাকবে উজ্জ্বল হয়ে।

আমার প্রত্যাশা 'দীপ্তিমান মহিমাময় টাঙ্গাইল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়; তার ছাত্রী সন্ড়ানদের বক্ষে ধারণ করে দিনদিন সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে। আমার জীবনের

প্রথম ও শেষ কর্মস্থল এই বিদ্যালয়; জীবনের বেশীর ভাগ সময় কোলাহলময় পরিবেশে ছাত্রী ও সহকর্মীদের সাথে কাটিয়েছি। শিক্ষার্থীদের জ্ঞান উপদেশ, ভালবাসা বিতরণের চেষ্টা করেছি। যেদিন শ্রেণিকক্ষে উপযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য পাঠদান করতে পারতাম, সেদিন নিজেকে খুব সার্থক মনে হতো। জ্ঞান বিতরণ শিক্ষকের ধর্ম ও কর্ম। এই কর্মে যুক্ত হয়ে আমার ছাত্রীদের আমি যা দিয়েছি, তার চাইতে অনেকগুণ বেশী শ্রদ্ধা সম্মান ও ভালবাসা পেয়েছি। যা অন্য পেশায় পাওয়া সম্ভব নয়। সুদীর্ঘ ৩৫ বৎসর যে শিক্ষক-শিক্ষিকা ভাইবোনদের সাথে এক পরিবারের মত অবস্থান করেছি, আপন জেনেছি- তাদের নিকট থেকে পেয়েছিও অনেক। যারা ইহজগতে নেই, আলণ্ঢাহ তাদের জান্নাতবাসী কর্ুন।

অবসর জীবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে সহকর্মী বন্ধুর স্মৃতি বিজড়িত কর্মক্ষেত্রের সুখ স্মৃতিচারণ করেই অপার শান্ড়ি উপভোগ করি। আর হাজার স্মৃতির বিশাল সঞ্চয় নিয়ে আগামী দিনগুলো বাঁচতে চাই। শুভ কামনা রইল সবার জন্যে।

আর 'তোমাদের এই হাসি খেলায়
আমি যে গান গেয়েছিলাম
সেই কথাটি মনে রেখো।'

আসমা খাতুন প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে অবসর গ্রহণ করার পর বিজ্ঞান শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেন দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সাথে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। আমি সকল শিক্ষক ও কর্মচারীদের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করি।

কোনো স্মৃতি মানুষের মনে সোনালি আল্পনা এঁকে দেয়। আমার মনের দুয়ারে আবেদন জাগায় বিদায়ের শেষ দিনটি। শিক্ষক কর্মচারী ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ বিদায়ের অনুষ্ঠানটি আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজনে উজ্জ্বল করে রেখেছিলেন। বিদায়ক্ষণে আমার বারবার মনে পড়ছিলো- এই আমার কর্মক্ষেত্র বিদ্যালয় অঙ্গন, যে স্থানটি আমার হৃদয়ে সবটুকু আসন দখল করেছিলো, সেদিন বিদায়লগ্নে একঝাঁক আলোর পাখি ছাত্রীদের দিকে তাকাতে কষ্ট হচ্ছিলো। ম্যানেজিং কমিটির সদস্যবৃন্দ শিক্ষক ও ছাত্রীদের বিদায়ী ভাষণে আমার বেদনাবিধুর মনকে আরো আবেগাপণ্ুত করে তুললো। বিজ্ঞান শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেন বিভিন্নভাবে বিদায়ের ছবি তুললেন। কেবল আমার মনের

ভিতরে একটি বেদনার সুর অনুরণিত হতে থাকলো–

জানি মুখে মুখে আর হবে না আমাদের জানাজানি
বুকে বুকে শুধু বাজাইবে বীণা বেদনার বীণাপাণি।

শেষ বিদায়ের দিন গভীরভাবে বুঝতে পারলাম আমার কর্মক্ষেত্রের প্রত্যেকটি মানুষ আমাকে কত ভালবেসেছিলো।

আমার বাবা

অবসর জীবনে মনের মাঝে অনেক কথা, অনেক স্মৃতি আকুলিবিকুলি করে। সেইসব স্মৃতিকথা কাগজের বুকে কিছু স্থান পায়; কিছু মনের গভীরে হারিয়ে যায়। পিছনে ফেলে আসা স্মৃতি আমার মানসপটে শরতের সাদা মেঘের আকাশের মাঝে উঁকি দেয়া নীল নীল ছোপমাখা রঙিন আকাশের মত দোল খায়। প্রিয়জন যারা চিরজনমের মতো পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, তাদের কথা মনের অজান্েড় ভেসে বেড়ায়। তার মধ্যে আমার বাবাকে নিয়ে অনেক স্মৃতি আমার মানসপটে আঁকা আছে। যার অনেকটাই আমাকে বাবার কথা বেশি করে মনে করিয়ে দেয়।

আমার বাবা মৌলবী আব্দুল গফুর। গ্রামে 'মৌলবী সাব' হিসাবেই বাবার পরিচিতি ও সুনাম। সেই কবেকার কথা, তখন গ্রামে এতো লেখাপড়া জানা লোক তেমন বেশি ছিল না। মার কাছে গল্প শুনেছি। বাবা সিরাজগঞ্জ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন। তখন যাতায়াতের জন্য এতো গাড়ি বা রাস্ড়া ছিলো না। দূরদূরান্েড় সবাই পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতো। বাড়ি থেকে রাস্ড়ায় খাওয়ার জন্য চিড়ামুড়ি পোটলা করে নিয়ে যেতো। গ্রামের অবস্থাপন্ন, বংশীয় ও সৌখিন লোকদের মধ্যেই লেখাপড়া সীমাবদ্ধ ছিলো। শুনেছি অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আমার চাচারা আসাম চলে যান। সুযোগ হলেই বাবা ভাইদের কাছে চলে যেতেন। একসময় বিভিন্ন মাদ্রাসায় লেখাপড়া শেষ করে বাবা একাশি জুনিয়র হাইস্কুলে শিক্ষকতা করার সুযোগ পান। ষাটের দশকের আগেই বাবা সাধুটি নজীব উদ্দিন জুনিয়র হাইস্কুলে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন মৌলবী শিক্ষক।

আমি প্রাইমারি শিক্ষা সমাপ্ত করে সাধুটি নজীব উদ্দিন জুনিয়র স্কুলে ভর্তি হই। সে সময় ঐ স্কুলে যাওয়ার মতো সহপাঠী আমার ছিলো না। সেই ৬২-৬৩ সনের কথা। আমরা মুষ্টিমেয় কয়েকজন মেয়ে স্কুলে যেতাম। ৫ম শ্রেণি পর্যন্ড় পড়ালেখা করে অনেকেই ইস্ড়ফা দিলো। বাবার সাথেই আমি স্কুলে যেতাম। মজা হতো বর্ষার দিনে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে পানি কম থাকায় নৌকা ঠেলেঠুলে চালাতে হতো। বাবা লগি ধরলে আমি নেমে নৌকা ধাক্কা দিতাম। না

হয়, আমি লগি ধরলে বাবা ঠেলে নৌকা পার করতেন।

বাবার পাখি পোষা ও মাছ ধরার নেশা ছিলো। বাবা আমাদের বাড়ির সমুখে গাঙে শিবজাল ফেলে মাছ ধরতেন। জালে ওঠা মাছগুলো সাদা রূপার মতো চকচক করতো। আমি খুশি হয়ে খালুইতে মাছ তুলতাম। আশ্বিন-কার্তিক মাসে বাবা চাটাকুড়ি নদীতে মাছ ধরতে যেতেন। বাবার সহযোগী ছিলো পুবের বাড়ির কদ্দুস ভাই, হাশেম ও কুদরত আলী। সারারাত মাছ ধরে তবেই বাড়ি ফিরতেন। আমরা অপেক্ষা করতাম বাবা কখন মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরবেন। বোয়াল, আইড়, গজার, শোল ও বড় বড় বাইন মাছের বোঝা হাশেম কাঁধে বহন করে আনতো। আমার মা বড় বড় কলার পাতা বিছিয়ে উঠানে মাছ জমা করে রাখতো। পাড়া প্রতিবেশীরা মাছ দেখার জন্য ভিড় জমাতো। সবাই আনন্দ ভরে মাছ দেখতো। সেকালে আশ্বিন-কার্তিক মাসে মাছের মড়ক দেখা দিতো। গাঙ নদী খাল বিলে প্রচুর মাছ ভেসে ওঠতো। বাবা কোড়া ও ডাহুক পুষতেন। সেই কোড়া ও ডাহুক দিয়ে বন্য কোড়া ও ডাহুক শিকার করতেন। বাবা শিকারে গেলে আমরা অপেক্ষায় থাকতাম আজ কয়টা পাখি শিকার হবে, বাবা কখন ফিরবেন। কোনোদিন বেশ কয়টা পাখি শিকার হতো, কোনো দিন হতো না। বাবা শিক্ষকতা থেকে অবসর হলে ঘর-সংসার ও জমিজমার কাজ দেখতেন। এ সময় সাধুটির কদ্দুছ ও হাশেম বাবার কাজে সাহায্য করতো। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বাবার শিকারের নেশা কমে গেলেও একেবারে বাদ দিলেন না। শেষ পর্যন্ড় একটা কোড়া পাখি রয়ে গেলো। আষাঢ় মাসে নতুন পানি হলে বন্য কোড়ার ডাক শুনে আমাদের কোড়া পাখিটা টুব টুব ডেকে ওঠতো। বাবা শিকারের জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠতেন। একপর্যায়ে বাবা শিকার করা একেবারেই ছেড়ে দিলেন। কিন্তু বাবার আদরের লাল ঝুঁটি ও হলুদ পায়ের সৌন্দর্যমন্িত একটি কোড়া দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশত মহব্বতের সাথে পুষতে থাকেন। মাটির বড় চাড়িতে পানি ভর্তি করে দিয়ে কোড়ার খাঁচা ভিজিয়ে রাখতে হতো। যাতে খাঁচার অর্ধেক ডুবে থাকে। এরা জলজ প্রাণি। তাই সারাবৎসর আমার মায়ের একটা বাড়তি ঝামেলা ছিলো কোড়ার চাড়িতে পানি দেয়া। সেই ৬৫ সনের কথা। আমি তখন মিয়াভাইর বাসায় থেকে মুসলিম গার্লস স্কুলে পড়ি। বাবা ময়মনসিংহে বেশ কয়েকদিন থাকলেন। বাড়ি থেকে মেজোভাই পত্র লিখেছেন, বাবা পত্রখানা পড়ে বিমূঢ় হয়ে বসে কাঁদতে শুর“ করলেন। বাবার সে কী কান্না! বাসার সবাই বাবার অবস্থা দেখে চিন্ড়িত হলাম। আমি বাবার হাত থেকে পোস্টকার্ডে লেখা পত্রটি পড়ে চাপাহাসি দিয়ে

বাবার অলক্ষ্যে কান্নার কারণ সবাইকে বলে দিলাম। মার সচেতনতার অভাবে বাবার এতো আদরের কোড়া পাখিটা দিনের বেলায়ই শিয়ালে খাঁচা ভেঙ্গে ধরে নিয়ে গেছে। সেই থেকে বাবা আর কোনো কোড়া পোষেননি।

আমার বাবা ভালো ফুটবল ও হা-ডু-ডু খেলতেন। বাবার মুখে তার ফুটবল খেলার অনেক অভিজ্ঞতার কথা শুনেছি। খেলতে গিয়ে একবার হাতে প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছিলেন। বয়স বেড়ে গেলে খেলা ছেড়ে দেন। আর বাবার পেশাগত কারণেই খেলা ছাড়তে হয়েছে। বাবা শিক্ষকতার পাশাপাশি টিউশনি করতেন। সংসারের আয় ও বাবার বেতন দিয়ে সংসার চালাতে খুব কষ্ট হতো। বৎসরে দুইবার বাবা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার মাঠে ইমামতি করতেন। জানাযার নামায পড়াতেন। আমরা ৭ ভাই-বোন। ভাইয়েরা তখন বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করতো। তাদের লেখাপড়ার খরচ যোগাতে বাবাকে হিমশিম খেতে হতো। আমার বেশ মনে আছে, বাবা প্রতিমাসে স্কুলের বেতন পেতেন না। তখন ছাত্র বেতনের আদায়কৃত টাকা শিক্ষকগণ আংশিক হারে বণ্টন করে নিতেন। সে সময় বেসরকারি স্কুল-কলেজে ডিয়ারনেস এলাউন্স দেয়া হতো সরকারের পক্ষ থেকে। তাও আবার ৪ মাস ও ৬ মাস পরপর পাওয়া যেতো। কলেজে পড়ুয়া ভাইদের খরচের টাকা জোগাড় করতে বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। মার হাঁস-মুরগি ও ডিম বেচা টাকা এবং কষ্ট করে জমানো টাকা বাবা ছেলেদের হাতে তুলে দিয়ে তৃপ্ত হতেন। আমাদের অনেকগুলো সুন্দর গরু ছিলো। বেশি সমস্যা হলে গরু ও ছাগল বিক্রি করে বাবা নানা প্রয়োজন মিটাতেন।

বাবার শ্রম ও কষ্ট সফল হয়েছে। বড় ভাই আব্দুল কাদীর, কন্ট্রোলার, ভূমি মন্ত্রণালয়, মেজো ভাই হযরত আলী হেলথে, সেজো ভাই সুফী আব্দুস সামাদ, বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ করটিয়া সা'দত কলেজ, সবার ছোট শরীফুজ্জামান চানমিয়া একজন প্রতিষ্ঠিত নামকরা হোমিও ডাক্তার। বাবা তার মেয়েদের শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত জামাতা ও বংশীয় ঘরে বিয়ে দিয়েছেন।

স্কুল বন্ধ হলেই বাবা ময়মনসিংহ কাঁচিঝুলি মিয়াভাইর বাসায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিতেন। মা আতপ চাল, সিদ্ধ চাল, ছাতু, খেসারি ও মুসুরির ডাল পোটলা করে রেখে দিতেন। গাছের মৌসুমী ফল- আম, আতা বেল নিতে কষ্ট হলেও মা দিতে ছাড়তেন না। তখন এতো নানা জাতের গাড়ির প্রচলন ছিলো না।

টাঙ্গাইল থেকে দিনে ৩/৪টা গাড়ি ময়মনসিংহ যাতায়াত করতো। আমরা

ময়মনসিংহ যেতে রওনা দিলে ব্রাহ্মণশাসন ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতো। কোনো কারণে গাড়ি না আসলে আবার বাড়ি ফিরে যেতাম। ভাইদের বাড়ি আসার কথা থাকলে বর্ষা মাসে বাবা নৌকা নিয়ে ব্রাহ্মণশাসন থেকে আনতে যেতেন। দীর্ঘ অপেক্ষার পর বাবা বাড়ি ফিরতেন। কোনো সময় মিয়াভাই আসতেন, কোনো সময় আসতেন না। বাবা গভীর রাতে মন খারাপ করে বাড়ি ফিরতেন। মা রান্না করে খাবার নিয়ে রাত জেগে বসে থাকতেন। সেজো ভাই আব্দুস সামাদ দীর্ঘদিন নাগরপুর কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। বাবার বেশির ভাগ ঝোঁক ছিল ওখানে যাবার। তখন নাগরপুর যাওয়া এতো সহজ ছিলো না। টাঙ্গাইল থেকে পায়ে হেঁটে, ঘোড়ার গাড়িতে করে যেতে হতো। ভাড়া সাশ্রয়ের জন্য বাবা সঙ্গী খুঁজতেন। ৬/৭ ঘণ্টা ঘোড়ার গাড়ির ঝাঁকুনি সহ্য করে বাসায় পৌঁছে নাতি-নাতনির আনন্দ দেখে রাস্তার সব কষ্ট ভুলে যেতেন। বাবার ছেলের বৌয়েরা বাবাকে খুব যত্ন করতেন। সময়মতো খাবার অযু গোসলের পানি দিতেন। বাবাও তার ছেলের বৌদের সাথে ভালো ব্যবহার করতেন।

বাবার একটি সদগুণ ছিলো আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যাওয়া; পর্যায়ক্রমে ফুফুদের বাড়ি ও নানার বাড়ির খোঁজ খবর নিতেন। আমি বাবার সাথে নানাবাড়ি গিয়েছি। বাঁশের সাঁকো পার হতে আমি ভয় পেতাম। বাবা আমাকে হাত ধরে সাঁকো পার করাতেন। শেষ বয়সে বাবা দূরে কোথাও যেতে পারতেন না। পাড়াপ্রতিবেশী ও ঘনিষ্ঠজনের বাড়ি প্রায়ই যেতেন। তারা বাবাকে সাদরে গ্রহণ ও আপ্যায়ন করতেন। বাড়ি ফিরে আমাদের গল্প করে শোনাতেন। নতুন গাছের আম, পিঠা-পায়েস তৈরি হলে প্রতিবেশীরা বাবাকে খাইয়ে তৃপ্ত হতেন। বাবা মিষ্টি খেতে খুব পছন্দ করতেন, এজন্য মা বেশি বেশি গুড় দিয়ে ক্ষীর, পায়েস রান্না করতেন। গাছের পাকা বেল, আতাফল, কুশাইলা গুড় দিয়ে ছাতু খেতে পছন্দ করতেন। অনেক সময় সকালের নাস্তার সময় বাবা গিয়ে কোনো বাড়ি খেতে বসেছেন। ফিরে এসে কি কি খাওয়া হলো সব গল্প করতেন। গ্রামের মৌলবী সাব, তাই বাবাকে ছাড়া কেউ নতুন গাছের ফল খেতো না। অবসরের পর এভাবেই বাবার জীবন কেটেছে। সময় হলেই পর্যায়ক্রমে ময়মনসিংহ মধুপুর নাটোর ও নাগরপুর ছেলেমেয়েদের বাসায় চলে যেতেন। নাটোর আমার বড় বোনের বাসায় যেতে বাবার খুব কষ্ট হতো। তখন যমুনা নদী লঞ্চ স্টিমারে পার হয়ে ওপার গিয়ে কয়েকটা গাড়ি বদল করে যেতে

হতো। এতো কষ্ট স্বীকার করে বাবা তার মেয়েকে দেখার জন্য ছুটে যেতেন।

মধুপুরে বুজির বাসায় গেলে বাবা খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। আমার বাসায় এলে আমি বাবাকে সে রকম যত্ন নিতে পারিনি। আমি শিক্ষকতা করি, এটা আমার দুর্ভাগ্য, আমি বেশিদিন বাবাকে সেবা করার সুযোগ পাইনি। বেতন পেয়ে কিছু টাকা দিতাম, বাবা খুব খুশি হতেন। আমার উপর অনেক ভরসা করতেন।

বাবা খুব ভোরে ওঠে ফজরের নামায পড়তেন। তার কণ্ঠে উচ্চস্বরে একামত ও সুরা শুনেই ছোটবেলায় আমার অনেক সূরা ও দোয়া মুখস্থ হয়ে গেছে। আলেম-ওলামাদের নিয়ে তিনি জালালী খতম, মিলাদ ও কোরআন খতম পড়তেন। বাবা জানাযার নামায পড়াতেন। খুব সুমিষ্ট স্বরে মিলাদ পড়াতেন। চান্দ্রমাসের উলেণ্টখযোগ্য দিনে বাবার দাওয়াত হতো মিলাদ পড়ানোর জন্য। আচকান, শেরোয়ানি, পাগড়ি পরে মিলাদের কিতাবখানা হাতে নিয়ে বাবা যখন বাড়ি থেকে বের হতেন সেদৃশ্য কতই না সুন্দর! এখন অনেক মিলাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি। আমার বাবার মিলাদ অনুষ্ঠানের দৃশ্য আমার মনকে এখনও আকর্ষণ করে।

বাবা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে ইমামতি করতেন। খুতবা ও দোয়া করার সময় আল- াহ ও নবী প্রেমে আপণ্টুত হয়ে নিজে কাঁদতেন; সমবেত মুসুলিণ্ট ও নামাযিরা কেঁদে বুক ভাসাতেন।

বাবার হেফাজতে অনেকগুলো ধর্মীয় বই থাকতো। আমি অল্প বয়সেই বাবার সংগ্রহের কারবালার কাহিনি, আবু হানিফার জীবনী, সখিনার জঙ্গ পড়ে ফেলেছি।

বাবার মুখে সেকালের বিখ্যাত গায়ক আব্বাস উদ্দিনের গল্প শুনেছি। একবার একাশী স্কুলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আব্বাস উদ্দিন এসেছিলেন। দূরদূরান্ড় থেকে অনেক লোকের সমাগম হয়েছে। প্যান্ডেলের বাইরে থেকে শিল্পীকে দেখার চেষ্টা করছে। স্থানীয় শিল্পীদের পরিবেশনায় সঙ্গীত পরিবেশন হলো। সবার দৃষ্টি আব্বাস উদ্দিন কখন মঞ্চে আসবেন। তখন হ্যাজাকবাতির সাহায্যে অনুষ্ঠান হতো। অপেক্ষার পর গায়ক মঞ্চে আসলেন। হারমোনিয়ম হাতে দরাজ গলায় সুর তুললেন, 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে'। ও 'বন্ধু কাজল ভোমরারে', গান শুনে দর্শকেরা করতালিতে মঞ্চ কাঁপিয়ে তুললো। পরবর্তীতে আব্দুল আলীমের 'দুয়ারে আইসাছে পালকি', 'নদীর কুল নাই কিনার নাইরে' ইত্যাদি ইসলামী গান বাবা পছন্দ করতেন। বাবা গুন গুন করে গাইতেন- 'ও আমার

দরদী আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না' ......। রেডিওতে বাবা ইসলামী গান শুনতে পছন্দ করতেন।

আমাদের গ্রামে বাবার যথেষ্ট সুনাম ও কদর ছিলো। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ড় বাবা সে সুনাম ধরে রেখেছিলেন। বাবার মধ্যে যে সদগুণ ছিলো, তাই পাড়া-প্রতিবেশীদের আকৃষ্ট করেছিলো। এখনও গ্রামে বাবার যথেষ্ট সুনাম ও যশ রয়েছে। কারও কোনো সমস্যা ও দুর্যোগ হলে বাবা এগিয়ে যেতেন। নানা ধরনের পরামর্শ দিতেন ও আলণ্টাহর নিকট সাহায্য চাইতেন। জন্ডিস চিকিৎসায় বাবার খ্যাতি ছিলো। দূরদূরান্ড় থেকে রোগী আসতো। বাবা পিপলের ডাঁটার মালা তৈরি করে দোয়া পড়ে রোগীর মাথায় পরিয়ে দিতেন। দোয়ার বরকতে সেই মালা দিন শেষে শরীর বেয়ে পড়ে যেতো। রোগীর পথ্য ছিলো গোসল করে আতপ চালের ভাত ও করলা ভাজি। জীন ভূতে পাওয়া রোগীকে বাবা ঝাড়ফুঁক দিতেন। আলণ্টাহর রহমতে রোগী সুস্থ হতো।

বাবা ইতেকাফ ও যিকিরে বসতেন। 'লা ইলাহা ইলণ্টালণ্টাহ ও আল- াহু আলণ্টাহু' যিকিরে দীর্ঘসময় কাটাতেন। নামায শেষে আলণ্টাহর নিকট দোয়া-দর"দ পড়ে ছেলে-মেয়েদের জন্য মোনাজাত করতেন। তার ছেলেমেয়েদের নাম ধরে ধরে বলতেন- আমার খোকা, আমার হযরত, সামাদ, রাবিয়া, সুফিয়া ও 'চানমিয়া সবাইকে হায়াত দারাজ করো ও সহিসালামতে রাখো। মুক্তিযুদ্ধের সময় তখনও পাক বাহিনী মধুপুর প্রবেশ করেনি। ১৪ এপ্রিল ১৯৭১ পাক বাহিনী মধুপুরের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে বীর মুক্তিবাহিনী আগাম সংবাদ পেয়ে মধুপুর ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে পাকবাহিনীর প্রবেশের পথ র"দ্ধ করে দেয়। ঐদিন আমরা নেত্রকোণা থেকে ময়মনসিংহ হয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। মধুপুরে বাধা পেয়ে পাকবাহিনীর মর্টারশেল, মেশিনগানের গুলিতে আতঙ্কে মানুষ ছুটাছুটি করছে। আমরা মুক্তিবাহিনী ও পাকবাহিনীর গোলাগুলির মধ্য চাড়ালজানিতে দুইপক্ষের মাঝে পড়ে যাই। ভয়াবহ পরিস্থিতিতে সেদিন মৃত্যুর ক্ষণ গুণছিলাম। বাবা নাকি সেদিন আমাদের জন্য প্রাণ ভরে দোয়া করেছিলেন। বাবার দোয়ার বরকতেই সেদিন ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে নিয়ে সবকিছু হারিয়ে জীবন নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম। ভাতিজা কুদরত আলী বাবার মুনাজাত নকল করে ক্ষ্যাপাতো- আমার খোকা, আমার হামিদা, আমার সুফিয়া............।

আমার বাবা সমাজে প্রতিষ্ঠিত, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গুণী মানুষ ছিলেন। বিয়ে-শাদি, পারিবারিক সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে সবাই বাবার নিকট পরামর্শ নিতে আসতো।

গ্রামের বর্ষীয়ান মুরুব্বি হিসাবে পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের বিয়েশাদির বরযাত্রী হয়ে যেতেন। বিশেষ করে নাতনি রমিছার বিয়েতে অনেক রাস্তা হেঁটে গিয়ে আসার সময় সমস্যা হয়েছিলো; তবুও বাবা মন খারাপ করেননি। নাতি-নাতনিরা বাড়ি এলে বাবা খুব খুশি হতেন। সাত সন্তানের জনক আমার বাবা। ছেলেরা সবাই প্রতিষ্ঠিত। নাতি-নাতনিরা কেউ ডাক্তারি, কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। এ নিয়ে তার খুব গর্ব ছিলো। শেষ জীবনে চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ ছিলো বাবার। বাবা তার লক্ষ্যের শেষ সীমায় হয়তো পৌঁছাতে পারেননি। হয়তো অনেক বাবাই অতৃপ্ত থেকে যান। কোরআন পাঠ, ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করে শেষের দিকে বাবা সময় কাটাতেন। ছেলেমেয়েদের বাসায় ও আত্মীয়বাড়ি বিচরণ কমে গেলো। সংসারের টুকিটাকি কাজের আগ্রহও কমে গেলো।

৭৭ সনের প্রথম দিকে বাবা বেশ দুর্বল হয়ে পড়েন। গ্রামে তখন তেমন বড় ডাক্তার ছিলো না, এখনও নেই। বাবার জন্ডিস হলো। প্রায়ই জ্বর থাকতো। মিয়া ভাই ময়মনসিংহ নিয়ে গেলেন। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাবা বাড়ি ফিরে আসেন। আমি সাপ্তাহিক ছুটি হলেই বাবাকে দেখতে যেতাম। বাবা সুস্থদেহী মানুষ ছিলেন। তাই কঠিন অসুখে আক্রান্ত হয়েও মনোবল হারাননি। লাঠি হাতে কাঠের খড়ম পায়ে উঠান ও বাইরে হাঁটা-চলা করতেন। মা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন। মা চিন্তিত হলে বাবা বলতেন- খোকার মা, তুমি চিন্তা করো না, সুফিয়াও তোমার ছেলের মতো। ও তোমাকে দেখবে।

আজ জীবনের বাঁকে হারিয়ে যাওয়া অনেক স্মৃতি থেকে থেকে দোল খায়। সে বৎসর মেজো ভাবীর জমজ দুটি মেয়ে হলো। ওদের দেখে বাবা খুব খুশি হলেন। জন্মের ৭/৮দিন পর মেয়ে দুটি মারা গেলো। বাবা ক্রমশই দুর্বল হতে থাকেন। একসময় শয্যাগত হলেন। ছোট ভাইর ছেলে রওনক ধনুষ্টংকারে আক্রান্ত হয়ে অকালেই মারা গেলো। তার মৃত্যু সংবাদ বাবাকে দেয়া হয়নি। আমি এ সময় সুযোগ হলেই বাবার জন্য রান্না খাবার ও মিষ্টি নিয়ে যেতাম। বাবা রসগোল্লা খুব পছন্দ করতেন। শেষবার বাবাকে দেখতে গেলাম। বাবা বললেন- শিউলিকে আনো নাই কেন? তখন ওর চতুর্থ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা চলছিলো। আমার ছেলে-মেয়েদের দেখাশুনার জন্য মা আমার কাছে প্রায়ই থাকতেন। এ নিয়ে বাবার কোনো অনুযোগ ছিলো না। বরং কিভাবে আমাকে সাহায্য করবেন এ নিয়ে বাবা ভাবতেন।

দিনদিন বাবা দুর্বল হয়ে গেলেও চিন্তাশক্তি ও সময়জ্ঞান হারাননি। নামাযের ওয়াক্ত হলেই অযুর জন্য তৎপর হতেন। শেষ সময়ে বেনামাযি কেউ যেন মুখে দুধ, পানি না দেয়, সবাই যেন কালেমা পড়ে এই বলে হেদায়েত করলেন। ১৯৭৭ সনের ১০ ডিসেম্বর ভাতিজা রতনের খাতনা উপলক্ষে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিলো। আমার স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা চলছিলো বিধায় আমার যাওয়া হয়নি। ঐ দিন আছরের নামাযের পর থেকে বাবা শেষ প্রস্তুতি নিলেন। মাথায় পাগড়ি পরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পাশে ছিলেন মা, মেজো ভাই-ভাবী, মধুপুরের দুলাভাই-বুজি। ছোট ভাই চান মিয়া। দুলাভাই ইয়াসিন সূরা পাঠেরত। মাগরিবের আগেই তৈয়ম্মুম করার জন্য বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়েন। চান মিয়া যতন করে মাথায় পাগড়ি বেঁধে তৈয়ম্মুম করে দিলো। মাকে বললেন- খোকার মা, আমি এখন চলে যাবো– এই বলে মাগরিবের নামায শুয়েই ইশারায় আদায় করেন। ঘর ভর্তি লোকজন সবাই কালেমা পড়ছেন।

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি। যে পাখিটি বাবা দীর্ঘ ৮৫ বছর নিজের ভিতর লালন করে রেখেছিলেন, সেই পাখিটি খাঁচা মুক্ত হওয়ার জন্য ছটফট করছে। ক্রমশই বাবা নিস্তেজ হতে থাকলেন। বাবা আল- াহর যিকির ও কলেমা পড়ছেন। শয্যাপাশে উপস্থিত কেউই বুঝতে পারলো না। কখন বাবার দেহ থেকে আত্মা পাখিটি খাঁচা ছেড়ে চলে গেলো। ‘ইন্না লিল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন’।

সে সময় গ্রামে প্রতিষ্ঠিত কোনো গোরস্থান ছিলো না। তাই বাবার নিজ হাতে গড়া বাড়ির দক্ষিণ পাশে কবরের সিদ্ধান্ত হলো। এখন গ্রামে প্রতিষ্ঠিত একটি গোরস্থান হয়েছে। বাবার অছিয়ত অনুযায়ী মিয়াভাই জানাযার নামায পড়ান। বাবার ভক্ত, অনুরক্ত, ছাত্র, আলেম, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী অনেক লোক জানাযায় শরীক হন। আমরা আমাদের বাবাকে হারালাম। দীর্ঘদিন ধরে বাবার স্নেহ আদর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত। ‘রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বা ইয়ানি সগিরা’। আল- াহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন বাবাকে মোমিন বান্দাদের সাথে জান্নাতে ঠাঁই দেন।

আমার মৌলবী শিক্ষক বাবার জীবন কেটেছে অনাড়ম্বর পরিবেশে। তবুও সে জীবনে পরিতৃপ্ত বোধের কোনো অভাব ছিলো না। বাবা অল্পে তুষ্ট হতেন। তার ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তিনি তৃপ্ত ছিলেন। আজ তার নাতি-নাতনিরা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পেশায় অধিষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠিত।

বাবা বেঁচে থাকলে কতই না খুশি হতেন।

কড়ির পুতুল

কৈশোরের কোলাহল কেউ ভুলতে পারে না। জীবনের অনেক বসন্ড় অতীত হয়েছে, এখন শেষ অধ্যায়ে পৌঁছে গেছি। কিন্তু শৈশবের সেই রোমান্টিকতা এখনও আমার মনকে নানা আল্পনায় আলোকিত করে। শৈশবের সেই কোলাহলময় দিনগুলো বিশেষ দিনে স্মৃতিপটে জেগে ওঠে। স্মৃতি রোমন্থনে ফেলে আসা দিনগুলো আবার ফিরে পেতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছে করে আবার হারানো শৈশবে ফিরে যাই। চৈত্রের শেষ। রাত পোহালেই পহেলা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ। ঢোল মাদলের বাজনা মনে করিয়ে দিচ্ছে নতুন বৎসরের আগমন।

কোনো এক চৈত্র সংক্রান্ড়িতে মেলা থেকে পুতুল বর-বৌ কিনেছিলাম। আমার মেলায় যাওয়া তেমন হয়নি। পারিবারিকভাবে বাধা ছিলো। দু'একবার ছোটবেলায় বাড়ির কাছে মেলায় গিয়েছি। মেলা থেকে কেনা চীনা মাটির পুতুলটি ও কড়ি ৪টি আমার খুব প্রিয় ছিলো। দেখতে খুব সুন্দর হাঁড়িপাতিল ও পুতুলের প্রতি সবার দৃষ্টি থাকতো। হাঁড়ি-পাতিল ও পুতুলের বিয়ে খেলতাম। মাটির পুতুল বিয়ে দিতাম কিন্তু ঐ কড়ির পুতুলটি আমি কখনো হাতছাড়া করিনি। আলতামাখা রাঙা ঠোঁটের পুতুলের মিষ্টিহাসি এখনও আমি ভুলিনি। খেলার সময় পুতুলটির একখানা পা ভেঙ্গে যায়। এই পা ভাঙা পুতুলটির প্রতি আমার মমতা আরও বেড়ে যায়। খেলা শেষে ওকে যতন করে পোটলায় ভরে খেলার বাক্সে তুলে রাখতাম।

এখন অনেক আয়োজন করে মেলা বসে। ঘন ঘন মেলা হয়। তখনকার দিনে চৈত্রসংক্রান্ড়ি ও বৈশাখী মেলা ছাড়া তেমন কোনো মেলা হতো না। মেলায় ভারী জিনিসপত্র মাটির হাঁড়িপাতিল, হাতি-ঘোড়া, টিনের বাঁশি, বাঁশের বাঁশি, ডুগডুগি, চিনির সাজ, বিন্নির খৈ, আকড়ি শোভা পেতো। সাধ্য অনুযায়ী সকলেই কেনাকাটা করতো। এখন ছেলেমেয়েরা মেলায় যেমন প্রচুর কেনাকাটার সুযোগ পায়, আমাদের সময় তেমন ছিলো না। এক আনা, দুই আনা, চার আনায় আমরা দুহাত ভরে মেলার জিনিস কিনতাম। বাবা-মায়ের

নিকট বায়না ধরেও যখন মেলায় যাবার অনুমতি মিলতো না, তখন লুকিয়েই সঙ্গীদের সাথে অনেকেই চলে যেতো। তাদের নিকট আসলে বাড়তি খরচের টাকা থাকতো না। তাই মেলায় যাবার বায়নাও ভালো লাগতো না। তখন দুএক টাকা হলেই অনেক জিনিস কেনা যেতো। এখন ছেলেমেয়েরা মেলায় গিয়ে বেশ খরচ করে। তখনকার দিনে সে সুযোগ ছিলো না। গ্রামের কোনো কোনো ছেলেমেয়ে ঘুরে ঘুরে বানর নাচ ও সার্কাস দেখেই মজা পেতো। কেউ কেউ বাবা- মায়ের হাত ধরে ঘুরেই আনন্দ পেতো। কেনাকাটার তেমন ধুম ছিলো না।

তখনকার মেলার সপ্তাহ জুড়েই চিনিসাজ, বিন্নির খৈ, ছোটদের হাতে থাকতো। একটা চিনিসাজ হাতে নিয়ে একটু একটু করে চেটে খেতো, যাতে শেষ না হয়। এখন আমার নাতি-নাতনিরা চিনিসাজের মাথা ভেঙ্গে খায়, কেউ বা দু'একবার স্বাদ আস্বাদন করেই ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এখন দোকানের ফাস্টফুড ওদের র্চি কেড়ে নিয়েছে। প্রত্যেক পরিবারে এখন আধুনিক খাবারের ধুম। যতই আধুনিক খাবার আসন দখল কর্ক, র্চি পরিবর্তনের জন্য যেমন আলু ভর্তা, টাকি মাছের ভর্তা পুরানো ঐতিহ্য বহন করেছে প্রতি পরিবারে। সে রকম আমরা প্রবীণেরা তিলের নাড়ু, গজা, জিলাপির স্বাদ ভুলতে পারি না।। ছোটবেলার মুড়ির মোয়া বাদাম টানা এখনও তাদের কদর অক্ষুণ্ন রেখেছে।

ছোটবেলায় মেলা থেকে ফিরে মেলার কেনা খেলাপাতি পুতুল নিয়ে সবাই শূন্যভিটায় একত্র হতাম। অন্যদের দেখানোর জন্য অপেক্ষা করতাম। এবাড়ির পুতুল মেয়ের সাথে ওবাড়ির পুতুল ছেলের বিয়ে দিতাম। ধুলোবালির রান্না ভাত, লতাপাতার তরকারি, মিছেমিছি খেয়ে আনন্দ পেতাম। বিদায়বেলায় সত্যি সত্যিই কান্না এসে যেতো। এই অভিনয়টাই বাস্ড়ব জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই পুতুলখেলার মধ্য দিয়েও বাস্ড়বে একটা সুসম্পর্ক অটুট থাকতো। খেলা শেষে ঘুড়ি উড়ানো, বাঁশি বাজানো, দল বেঁধে ধুপধাপ পুকুরে পড়ে সাঁতার কাটা বড়ই আনন্দদায়ক ছিলো। খেলা শেষে কচি আম ভর্তা খেয়ে দুপুর গড়ালেই বাড়ি ফেরা হতো। বর্তমানে মেলার পরিসর ও আয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে। চোখ ধাঁধানো নানা উপাদানে মেলার কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আমার কাছে আগের দিনের মেলাই স্থান দখল করে আছে। বর্তমানে পোশাক, রঙ-মেহেদিতে, বৈশাখী মেলার আকর্ষণ বেড়ে গেছে। শাড়ি, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, হাতে-মুখে আল্পনা, এ যেন মেকি বৈশাখ; এখন ঈদের আনন্দকেও ম্লান করে দেয়। নববর্ষের মন মাতানো সাজ। কিন্তু কোথায় যেন না পাওয়ার হাহাকার

ভারী হয়ে ওঠে। আমার শৈশবের স্মৃতিমধুর মেলা এখন আমার মনকে আলোড়িত করে। মেলার প্রান্ড় থেকে ভেসে আসা সুর রূপবান পালার গান-

'ও দাইমা বাড়ির দক্ষিণ পাশে
কিসের বাদ্য বাজে গো...'।
মাঝি বায়া যাওরে........
অকূল দরিয়ার মাঝে আমার ভাঙা নাও

বাঁশির সুরে..... কালা বাঁশি বাজায়, দুই নয়নের জলে রাধার বুক ভেসে যায়। এটা ছিলো রোমান্টিকতায় ভরা, মেলার প্রাণবন্ড় অনুষ্ঠান। সে সময় মেলায় নানা ধরনের সং ঢং ইত্যাদি গীত, পালা গানে মুখরিত হয়ে ওঠতো বাংলার প্রান্ড়র। বংশীবাদকের ছিদ্রওয়ালা বাঁশের বাঁশিতে আঙ্গুল খেলানো সুরে সবাই আপ-ুত হয়ে ওঠতো। ছোটবেলার সেই মেলার স্মৃতি রোমন্থনে এখনও সুখ পাই। এখনকার ছোটরা মেলায় গিয়ে খেলনা কিনে শো-কেসে ভরে রাখে। আমতলা-জামতলায় খেলার সুযোগ নেই। পুতুলের বিয়ে, সই পাতানো খেলার সুযোগ ওরা পায় না। পড়াশোনা, কোচিংএর ফাঁকে টিভিসেটের সামনে বসে মিকিমাউস, ডোরেমন, টম এন্ড জেরি দেখে সময় কাটায়। তারা একসঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পায় না। আমরা যেমন মেলা থেকে ক্রয় করা জিনিসপত্র নিয়ে শূন্যভিটায় খেলা করেছি। এই সুযোগে সবার খেলনা জিনিস দেখার সুযোগ হয়েছে, এখন আর তা হয় না। আমার স্মৃতিতে সেদিনের মেলা, পুতুল বিয়ে, রান্না-বান্না খেলা মনের জানালায় উঁকি দেয়। আমার শখের কড়ির পুতুলটি এখনো আমার মনে স্থান দখল করে আছে। এক পা ভাঙা সেই কড়ির পুতুলটি কোথায় কবে হারিয়েছি মনে নেই। তবে মেলার দিন আসলেই সেই পুতুলটি আমাকে হারানো শৈশবে নিয়ে যায়। এখন আমি মেলায় গিয়ে নাতি-নাতনিদের এটা-ওটা কিনে দেই। আমার সেই এক পয়সার বাঁশি ও কড়ির পুতুলটি সে সময় আমাকে পৃথিবী জয় করার মতো আনন্দ দিতো। এখন অনেক খেলনা পেয়েও ছোটরা তৃপ্ত হয় না।

আসুক বারে বারে দ্বারে দ্বারে চৈত্র সংক্রান্ড়ি, বৈশাখী মেলা। মনে থাকুক আমার শৈশব স্মৃতি বিজড়িত সেই এক পা ভাঙা পুতুলটির কথা।

মিয়াভাই

খোকা বাবা-মার বড় সন্ড়ান। বড় আদরের ডাক ‘খোকা’ এই নামেই পরিবার আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীর নিকট তিনি পরিচিত। আমার বাবা- খোকার বাবা, মা খোকার মা হিসাবেই সর্বমহলে সমাদৃত। আমাদের মিয়াভাই এসএমএ কাদীর খোকা। আমাদের ভাই-বোনদের মিয়াভাই। মিয়াভাই ডাক বা সম্বোধন এখন আর নেই। আগের দিনের সবার বড় ভাইকে মিয়াভাই বলে ডাকা হতো। বনেদি ঘরের বড় ছেলে ‘বড় মিয়া’ নামে গ্রামের লোকজনের নিকট সম্মান পেতো। আমরা ৪ ভাই ৩ বোন। সবার বড় মিয়াভাই। এসএম এ কাদীর, কনট্রোলার অব রেভিনিউ, ভূমি মন্ত্রণালয়, ঢাকা; সর্বজন শ্রদ্ধেয় আমার মিয়াভাই; পরিবার আত্মীয়স্বজন ও কর্মস্থলের সকলের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। আমরা ভাইবোনেরা তাকে যথেষ্ট সম্মান ও সমীহ করতাম। আমাদের পড়ালেখার জন্য মিয়াভাইর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। প্রথম সন্ড়ান হিসাবে বাবা-মার নিকট গুরুত্বও ছিলো অনেক। গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে তৎকালীন করটিয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট ও পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে সুনামের সাথে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। কর্মজীবনে তিনি দক্ষ অফিসার, জনদরদী ও সামাজিক গুণের অধিকারী ছিলেন। মিয়াভাইর তিন মেয়ে, দুই ছেলে। সবাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে সুনামের সাথে প্রতিষ্ঠিত।

বড় ছেলে– মঞ্জুরুল কাদীর, সাব ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, বাংলাদেশ টিএন্ডটি বোর্ড, ঢাকা।

বড় মেয়ে ডাক্তার- কানিজুন নাহার কাদীর, এসিসটেন্ট প্রফেসর, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা। ছোট ছেলে– মাহবুবুল কাদীর

আরজু, গ্রাফিক্স ডিজাইনার, মাস্টার্স, জার্নালিজম, ইতালিতে অবস্থান। মেজো মেয়ে নাজমুননাহার কাদীর, সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কিশোরগঞ্জ।

ছোট মেয়ে– নাজনীননাহার কাদীর রত্না, এগ্রি ইঞ্জিনিয়ার, এমএসসি ওয়াটার, রিসোর্সেস, জার্মান। বর্তমানে আমেরিকায় অবস্থানরত।

আমার শিক্ষা ও শিক্ষকতার পেছনে মিয়াভাইর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। উনার জন্যই আমি ‘শিক্ষিকা সুফিয়া আখতার’ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছি। তৎকালীন সংসদ সদস্য হুমায়ুন খালিদ আমাদের আত্মীয় ও মিয়াভাইর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উনার সহযোগিতায় টাঙ্গাইল উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার সুযোগ পাই। তৎকালীন স্কুল কমিটি প্রধান শিক্ষিকা রিজিয়া সালামের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমাদের ভাই-বোনের পড়ালেখার ব্যাপারে মিয়াভাই যথেষ্ট সুনজর রাখতেন। রাতের বেলা যখন আমরা কুপির আলোতে পড়াশুনা করতাম, তিনি বাইরে থেকে লক্ষ্য রাখতেন- আমরা কি পড়ছি, উচ্চারণ ভুল হলে কাছে এসে শুধরিয়ে দিতেন। খাতার পৃষ্ঠা খুলে শ্রেণির কাজ ও বাড়ির কাজ দেখতেন। ভুল ধরিয়ে দিতেন। হাতের লেখা সুন্দর হলে খুশি হতেন। ভাই-বোনের পরীক্ষার রেজাল্ট ভালো হলে খুশি হতেন।

আমি গ্রামের প্রাইমারি ও জুনিয়র হাইস্কুল পাস করে ময়মনসিংহ মুসলিম গার্লস স্কুলে ভর্তি হই। তখন গ্রামে হাইস্কুল ছিলো না। মিয়াভাই ময়মনসিংহে চাকরি করতেন। সেই সুবাদে তিনি আমাকে ঐ স্কুলে ভর্তি করান। গ্রাম্য পরিবেশ থেকে শহরে জীবন ভালো লাগতো না। গ্রামের মুক্ত মাঠ-ঘাট খেলার সঙ্গী-সাথীদের জন্য মন আকুল হয়ে থাকতো। এ সময় মঞ্জু, কণা, আরজুর সাহচর্যে বাড়ির কথা ভুলে যেতাম। ওদের সাথে আন্ড়রিকতা গড়ে ওঠায় আমার মন টিকে গেলো। ওরা তখন প্রাইমারিতে পড়তো। আমার ভাবী বেগম নুরুন্নাহার একজন সাহিত্যমনা মানুষ। উনার সাথেই আমার ময়মনসিংহের ছাত্রীজীবন কেটেছে।

আমার মিয়াভাই পাস করা আলেম না হলেও তার ইসলামী চেতনাবোধ প্রখর ছিলো। পরিবারের সবাইকে ইসলামী চেতনাবোধে উদ্বুদ্ধ করতেন। নামায, রোযা, রীতিমত আদায় করতেন। সুমিষ্ট সুরে নামাযের সূরা পাঠ ও কোরআন তেলাওয়াত করতেন। আবৃত্তিতেও তিনি দক্ষ ছিলেন। কবি নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের কবিতা তার কণ্ঠে শ্রুতিমধুর লাগতো। আমার প্রথম সন্ড়ান

শিউলীর জন্ম দত্তগ্রাম। মিয়াভাই ঘুম থেকে ওঠে সুমিষ্ট স্বরে আযান দিলেন। আলণ্ঢাহ পাকের কলেমা পাঠ করে শোনালেন নবজাতককে। ওর শরীফা নামটা মিয়াভাইর দেয়া। তার বড় একটা বৈশিষ্ট্য ছিলো নবজাতকের নাম রাখা। আমাদের পরিবারে সবাইর নাম মিয়াভাইর দেয়া। তিনি যে নাম রাখতেন ভাই-বোনদের, ছেলে-মেয়ের তা সবারই পছন্দ হতো।

তিনি পোষাকদুরস্ড় ছিলেন। কোর্ট প্যান্ট টাই পরে অফিসে যখন রওনা দিতেন, দেখতে খুব সুন্দর লাগতো। ইস্ত্রি করা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে আতর মেখে বের হতেন। পোষাক-পরিচ্ছদে তার মধ্যে একটা ইসলামী ঐতিহ্য প্রকাশ পেতো।

অন্যকে সুন্দর পরিচ্ছন্ন পোশাক পরতে উৎসাহ দিতেন। পাড়া-প্রতিবেশী এবং কর্মস্থলের লোকজনের নিকট তিনি প্রিয় ছিলেন।

মিয়াভাই যখন বিয়ে করেন তখন আমি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। বিয়ের দিনের কোনো ঘটনা আমার মনে নেই। তবে বাবা যখন মিয়া ভাবীকে ভূঞাপুর থেকে আনতে যেতেন নৌকা নিয়ে; আমি অপেক্ষা করতাম কখন ভাবী আসবেন। মাঝেমধ্যে আমিও ভাবীকে আনতে বাবার সাথে যেতাম। পরবর্তীতে ময়মনসিংহ কাঁচিঝুলির বাসায় আমিই ভাবীর কাছের মানুষ ছিলাম। ভাবীর হাতের রান্না খুব মজাদার হতো। আমার ভাবী সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনা গল্পরসিক একজন মানুষ। উনার স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর। কথার ছলে আলাপচারিতার মাঝে তিনি আগের দিনের অনেক কবিতা মুখস্থ শোনাতেন। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিলো তার মধ্যে।

আমার মাঐ মা (ভাবীর মা) প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁ সাহেবের ভাগ্নি। প্রাচীন শিক্ষিতা মানুষ ছিলেন। তৎকালীন বেগম রোকেয়া ও কবি সুফিয়া কামালের আদর্শে উজ্জীবিত ছিলেন। উনার কাছে তাদের গল্প শুনেছি। মাঐ মা রসালো ও রোমান্টিক গল্প বলে রাত কাটাতে পারতেন। যেমন সাত ভাই চম্পা, মধুমালা ও মদন কুমার। গানের কণ্ঠও ছিলো মিষ্টি। তিনি গাইতেন 'স্বপনে দেখি আমি মধুমালারে...'।

গল্পের মাঝে গানের কলিও অপূর্ব শোনাতো। তিনি শিল্পী আব্বাস উদ্দীনের গান

ও কবি জসিম উদ্দীনের কবিতা সুন্দর আবৃত্তি করতেন। গল্প কবিতা পাঠ করে তিনি রাত সাবাড় করে দিতেন। বাড়ির বড় জামাতা হিসাবে মিয়াভাইকে তিনি

খুব কদর করতেন। ভাবীর ভাই-বোনদের সাথে আমার সখ্যভাব ছিলো। বোন শামছুন্নাহার আপা, হাছনা আপা ও জ্যোৎস্না এদের সাথে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। জ্যোৎস্নার সাথে সেই অনেক আগে আরজুর বিয়েতে দেখা হয়েছিলো। শেরেবাংলানগর কমিউনিটি সেন্টারের খোলা মাঠে জ্যোৎস্নার সাথে অনেক কথা হলো। বিয়েবাড়ির এতো হৈ চৈ সত্ত্বেও আমরা আঙ্গিনা খুঁজে আমাদের জমানো কথাগুলো একে অন্যকে ব্যক্ত করলাম। এখন আর কারও সাথে তেমন দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। কোনো মানুষেরই জীবনে নিখাদ সুখ আসে না। মিয়াভাই পারিবারিক জীবনে পরিপূর্ণ সফল না হলেও তার ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে উপযুক্ত বনেদি ঘর ও বরে বিয়ে দিয়েছেন। তাদের ছেলে-মেয়েরাও উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে।

অবসর গ্রহণের পর মিয়াভাই তার প্রতিভার গুণে ভাওয়াল এস্টেট, গাজীপুরে চাকরি পান। এখানে দক্ষতা ও সুনামের সাথে বেশ কিছুদিন চাকরি করেন। আধুনিকতা বা বিলাসবহুল জীবন তিনি পছন্দ করতেন না। কিন্তু তার মধ্যে র–চিবোধের কোনো অভাব ছিল না।

কোনো মানুষই দোষ-গুণের উর্ধ্বে নয়। মিয়াভাইর জীবনেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। গাজীপুর এস্টেটের চাকরি ছেড়ে দেয়ার পর তিনি বাড়ির জমিজমার খোঁজখবর ও আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বেড়াতেন। টাঙ্গাইল আমার বাসায় আসতেন। আমার কাছে থেকে উনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। জমি সংক্রান্ড় ঝামেলায় জড়িয়ে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ড় হয়ে পড়েন। এ ব্যাপারে ঘনঘন দত্তগ্রাম ও ঘাটাইল তহসিল অফিসে যেতেন। টাঙ্গাইল থেকে ঢাকার বাসায় ফেরার পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। উচ্চ রক্তচাপজনিত কারণে স্ট্রোক করে দীর্ঘদিন বাসার বাইরে যেতে পারেননি। আমুদে, সদালাপী হাস্যরসিক মানুষটি অসুস্থ হয়ে ঘরের কোণে বেশ কয়েক বৎসর বন্দী হয়ে রইলেন। তার অসুস্থতাজনিত অক্ষমতা তাকে খুব পীড়া দিতো।

যে মানুষটি দীর্ঘদিন বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের বড় দায়িত্ব দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সাথে পালন করেছেন, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সাথে আসর জমাতেন; তিনি পরাস্ড় হলেন নিয়তির কাছে।

শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তাকে খুব কষ্ট দিতো। দীঘ চিকিৎসার পরও তিনি সুস্থ

হলেন না।

বড় সন্ড়ান হিসাবে বাবা-মার নিকট তার গুর"ত্ব ছিলো অনেক বেশি। অসুস্থ অবস্থায় অনেকবার ঢাকার বাসায় মিয়াভাইকে দেখতে গিয়েছি। উনি খুব খুশি হতেন। রোগমুক্তির জন্য আলণ্ঢাহর নিকট প্রার্থনা করেছি। বোনদের মধ্যে আমিই উনার সাহচর্য পেয়েছি। ভাতিজা-ভাতিজিদের সাথে আনন্দময় সময় কাটিয়েছি। ময়মনসিংহ কাঁচিঝুলির বাসায় থাকার আনন্দময় পরিবেশ স্মৃতি হয়ে আছে। সেখানে ঐশ্বর্যের বিলাসিতা না থাকলেও আনন্দের অভাব ছিলো না।

এ পৃথিবীতে কারও জীবন দীর্ঘস্থায়ী নয়। মিয়াভাইর জীবনেও মৃত্যু হাতছানি দিলো। তিনি শেষবার অসুস্থ হয়ে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ভর্তি হন। সদালাপী সদাহাস্যময় আমার মিয়া ভাই অচেতন অবস্থায় রইলেন। ১৭ মার্চ শুক্রবার সকাল ৯ ঘটিকায় তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান। 'ইন্নালিলণ্ঢাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'। আল- াহ সকল বিদেহী আত্মাকে শান্ড়ি দান কর"ন, বেহেশত নসিব কর"ন। আমিন।

আমাদের সকলের মিয়া ভাই আমাদের শোকসাগরে ভাসিয়ে পরপারে চলে গেলেন। মিয়াভাইর ইচ্ছা অনুসারে পারিবারিক গোরস্থানে বাবার কবরের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়। আলণ্ঢাহ সকল বিদেহী আত্মাকে শান্ড়ি দান কর"ন।

শাহ বাজপাখি ক্যান্সার

'শিয়রের কাছে নিবু নিবু দীপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলে,
তারি সাথে সাথে বিরহী মায়ের একেলা পরান দোলে।
... ...
পার্শ্বে জ্বলিয়া মাটির প্রদীপ বাতাসে জমায় খেল,
আঁধারের সাথে যুঝিয়া তাহার ফুরায়ে এসেছে তেল।'

কবি জসীম উদদীন পরম মমতায় অনাথিনী এক দুঃখী মায়ের র"গ্ন ছেলের বাঁচার আকুতি ও মায়ের নিবিড় ভালোবাসার এক কর"ণ চিত্র তাঁর পলণ্টীজননী কবিতায় তুলে ধরেছেন। কবি পলণ্টীমায়ের র"গ্ন ছেলের পরিণতির কথা আমাদের বলে যাননি। আমি আমার লেখায় আমার আদরের ছোট বৌমার কথা বলি। ফেরদৌসি তানজিন (পপু), ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং-এ বিবিএ, এমবিএ (ঢা.বি.) আমার ছোট বৌমা। আজ থেকে প্রায় তিন বৎসর আগে তুমি ক্যান্সার নামক এক বাজপাখির তীক্ষ্ণ থাবায় আক্রান্ড় হলে। বাজপাখি যেমন তার শিকারকে নখের নাগালে আঁকড়িয়ে ধরে, তেমনি ক্যান্সার তোমাকে আক্রান্ড় করলো। যার কাছ থেকে মৃত্যু তোমাকে

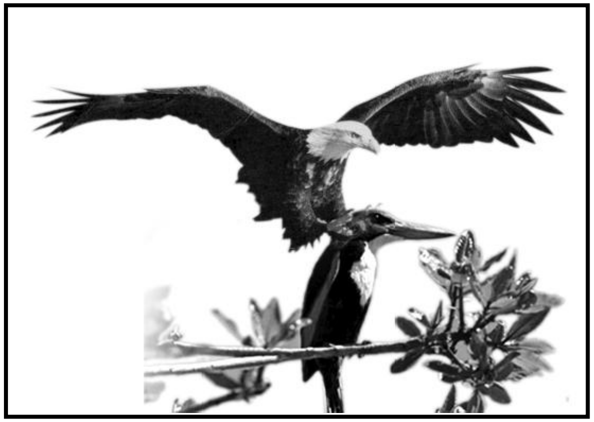

রেহাই দিলো না। সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল, ডেল্টা, স্কয়ার হাসপাতালের ডাক্তার কেউ তোমাকে সেই বাজপাখির থাবা থেকে মুক্ত করতে পারলো না। অর্থ-সম্পদ প্রিয়জনের প্রার্থনা-ভালোবাসা কোনো কিছুই তোমাকে ধরে রাখতে পারলো না। সিঙ্গাপুর হাসপাতালের দিনগুলোর বর্ণনা শুনে ব্যথিত হয়েছি, আলণ্ঢাহর কাছে তোমার রোগমুক্তির জন্য কত প্রার্থনা করেছি। তোমার শ্বশুর বিভিন্ন মসজিদ এতিমখানায় তোমার রোগমুক্তির জন্য দোয়ার আয়োজন করেছেন। পরিচিতজনের নিকট দোয়া চেয়েছেন। সাময়িক সুস্থ হলে আলণ্ঢাহর পবিত্র গৃহ কাবা শরীফ গিয়ে হজ করলে। মদিনা শরীফ নবীর রওজা মোবারক

জিয়ারত করলে। অসুস্থ শরীরে এসব সম্ভব হয়েছে তোমার দৃঢ় মনোবলের জন্য। তোমার বাঁচার আকাঙ্ক্ষা ছিলো তীব্র, তুমি বলতে আর ১৫টা বৎসর যদি বাঁচতে পারতাম। কী দৃঢ় মনোবল ছিলো তোমার! তুমি বলতে- মা, সুস্থ হয়ে গেলে আমি অন্যরকম মানুষ হয়ে যাবো। হ্যাঁ, তুমি অন্যরকম মানুষ হয়ে আমাদের ছেড়ে অন্য জগতে চলে গিয়েছো । ২৫ মে ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দে কোনো এক শুভক্ষণে তুমি নববধূর বেশে আমার বাড়ির আঙিনায় কামরাঙা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে। নববধূকে দেখার জন্য সবাই ব্যস্ত। দুধ-শরবত পান করিয়ে তোমাকে ঘরে তুলে নিয়েছিলাম আমি। সেই তুমি ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে সেই কামরাঙা গাছের ছায়াতলে সাদা পোশাকের কফিন জড়িয়ে চিরবিদায় নিলে। অল্প সময়ের জন্য এসেছিলে আমার সংসারে। জয় করেছিলে ছোট-বড় সবার মন। তোমার শ্বশুরকে তুমি কত ভালোবাসতে! সে ভালোবাসায় কোনো কৃত্রিমতা ছিলো না। তুমি ছিলে আমাদের সোনাবউ। বৌমা, আমাকে ক্ষমা করো। শেষ একমাস তোমাকে সঙ্গ দিতে পারিনি। তোমার শ্বশুর ও আমি বাসায় গেলে তুমি কতোই না খুশি হতে। দেখা মাত্র তোমার অকৃত্রিম হৃদয় নিংড়ানো হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করতে, জড়িয়ে ধরতে। সেইসব সুখস্মৃতি নিয়েই বেঁচে থাকতে চাই।

তোমার বাবার সম্পদ মমতাময়ী মা-বোনের প্রার্থনা, স্বামীর ভালোবাসা, সেবাযত্ন কোনো কিছুই তোমাকে ধরে রাখতে পারলো না। তুমি মায়ের বুক খালি করে, বোনের চোখের জল উপেক্ষা করে আমাদের ছেড়ে চলে গেলে। বৌমা, তুমি সামান্য উপঢৌকনে তুষ্ট ছিলে। আনন্দ পেতে অন্যকে কিছু দিতে। তুমি আমাকে একটি মোনাজাত লিখে দিয়েছিলে কিছুদিন আগে। আমি তা যতন করে রেখে দিয়েছি। তুমি পাক কোরআনের কালাম, দোয়া-দরুদ পছন্দ করতে। রোগশয্যায় তোমার পাশে এসবের বই থাকতো। রোগমুক্তির জন্য কত দোয়াই তুমি পড়েছো। বৌমা, তোমার দোয়া-দরুদ বৃথা যাবে না। আল্লাহর কাছে কোনো দোয়াই বৃথা যায় না। আল্লাহ তোমাকে অল্প সময়ের জন্য পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। তাই মরণব্যাধি ক্যান্সার দিয়ে তোমাকে পাপমুক্ত করে তুলে নিয়েছেন। আল্লাহপাক যেন তোমাকে সর্বোত্তম জান্নাত 'রিয়াজুল জান্নাত'-এ ঠাঁই করে দেন। বৌমা, তুমি নিশ্চয়ই শুনতে পাও। কতজন

কতভাবে তোমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছে। আমাদের ব্যথিত করে তুমি চলে গিয়েছো। সাদা কফিনে জড়ানো তোমাকে জড়িয়ে ধরতে মন চাইছিলো আমার; কিন্তু পারিনি। পরিস্থিতির জন্য আমি তোমাকে ছুঁয়ে দেখতে পারিনি। বাড়িতে মেহমান এলে থাকার জন্য কত করে বলে। সেদিন কিন্তু তোমাকে বিদায় দেয়ার জন্য সবাই ছিলো তৎপর- এটাই বিধির বিধান।

বৌমা, তুমি আমাদের এতোই ভালোবাসতে! জন্মভূমি ঢাকা শহর ছেড়ে নিভৃত ছোট্ট শহর টাঙ্গাইলের বেবিস্ট্যান্ড মসজিদসংলগ্ন গোরস্থানে তুমি শেষ আশ্রয় নিলে- আমাদের মাঝে। পরম করুণাময় আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা, করুণা ও অনুকম্পার মাঝে স্থান দিন, আমরা সবাই সেই দোয়া করি।

বৌমা, জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে আজ কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে-

'ওই দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবিরের রাগে,
অমনি করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে।
মসজিদ হতে আযান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজ কেয়ামত ভাবিতেছি কতদূর ॥'

ঈদ যুগে যুগে

ঈদ মানেই আনন্দ, ঈদ মানেই খুশি। আমরা দুটি ঈদ যথাযথ মর্যাদা ও আনন্দের সাথে উপভোগ করে থাকি। ঈদুল ফিতরের খুশির আমেজ না ফুরাতেই ঈদুল আযহার প্রস্তুতি দ্বারে দ্বারে। আমরা ছোটবেলায় বলতাম ছোট ঈদ ও বড় ঈদ। ছোট ঈদ বা ঈদুল ফিতর উদযাপনে ছোট বড় সবার মধ্যে বাহারি পোশাক ও রকমারি খাবার প্রস্তুতের ধুম পড়ে যায়। ঈদুল আযহা বা কোরবানির ঈদকে বকরা ঈদও বলা হয়। ঈদ উদযাপনের মধ্যে মুসলিম সমাজের ধর্মীয় গাম্ভীর্য ও ঐতিহ্য যুগে যুগে প্রবহমান রয়েছে। সে কালের ঈদ উদযাপনের সাথে একালের ঈদ উপভোগের অনেক তফাৎ রয়েছে। এ কালের ঈদ উদযাপনে রয়েছে বাহারি আয়োজন। দুই ঈদেই সেমাই চিনি, মসলার দোকানে ক্রেতার পদভারে মুখর হয়ে ওঠে। কোরবানির ঈদে গরু ছাগল কেনার প্রস্তুতি ও আয়োজন মুসলিম পরিবারে ধর্মীয় অনুভূতির সাড়া জাগায়। যুগের পরিবর্তনের সাথেই ঈদ উদযাপনের ধরনও বদলে গেছে। ছোট ছেলেমেয়েরা আগের দিন রাতে আতশবাজি পটকা ফুটিয়ে ঈদকে স্বাগত জানায়। টিভির অনুষ্ঠান দেখে। দলবেধে কেউ বেড়াতে পছন্দ করে। বড় শহরের শিশু-কিশোররা শিশুপার্ক ও চিড়িয়াখানায় ঘুরে আনন্দ উপভোগ করে। চাকরিজীবীগণ অন্তত বৎসরে ২ বার ঈদ উপলক্ষে দেশের বাড়ি গিয়ে ঈদ উপভোগ করেন। গ্রামের মেঠোপথে ঘুরে প্রকৃতির শোভা দর্শন করেন। আগের দিনে ঈদের এমন আনন্দ ছিলো না।

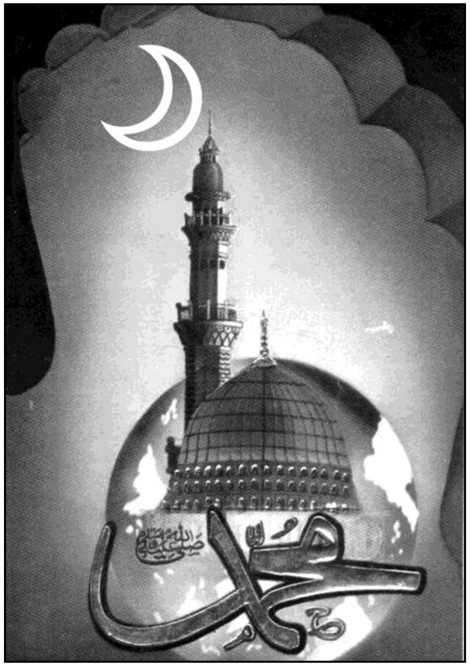

আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য হাসিলের উদ্দেশ্যে ধর্মপ্রাণ মুসলমান ঈদুল আযহায় পশু কোরবানি করার মধ্য দিয়ে পালন করে থাকে। আল্লাহর উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করার নামই হচ্ছে কোরবানি। ১০ই জিলহজ এই বিধানটি পালন করা হয়। ইসলামে কোরবানির গুরুত্ব অপরিসীম। সামর্থ্যবান ব্যক্তির পক্ষে কোরবানি করা ওয়াজিব। রসূল সাল্লাল্লাহু (আ.) বলেছেন যে ব্যক্তির কোরবানি করার সামর্থ্য আছে সে যদি কোরবানি না করে, তবে সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে। কোরবানির গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত আয়শা থেকে বর্ণিত রসূল সাল্লাল্লাহু (আ.) ইরশাদ করেন– কোরবানির দিনে কোরবানির চেয়ে কোনো আমল আল্লাহর কাছে অধিক পছন্দনীয় নয়।

কিয়ামতের কঠিন ময়দানে কোরবানির পশু তার শিং চুল খুর নিয়ে হাজির হবে। কোরবানির পশুর রক্ত মাটিতে পতিত হওয়ার আগেই তা আল্লাহ তায়ালার কাছে পৌঁছে যায়। তাই তোমরা ইখলাস ও আন্তরিকতার সঙ্গে কোরবানির যাবতীয় কাজ সম্পাদন করো।

আমাদের দেশে বর্তমানে ব্যাপক কোরবানির প্রচলন দেখা যায়। আগের দিনে এমনটি ছিলো না। ১৬ শতকেও এদেশে কোরবানির প্রচলন ছিলো না। রাজা জমিদার ও সম্পদশালী বিত্তবানেরা দুই ঈদে ভোজ ও আপ্যায়নের মধ্য দিয়ে ঈদ উদযাপন করতেন। জামাতে ঈদের নামায পড়তেন। ইমাম সাহেব খুতবা দিতেন। খুতবায় সবার জন্য দোয়া করতেন। রাজা জমিদারগণ বস্ত্র বিতরণ ও রেজগি (খুচরা মুদ্রা) ছিটিয়ে দিতেন। অনেকে তা শুভেচ্ছা উপহার হিসাবে কুড়িয়ে নিতেন। সে আমলে ঈদে জাঁকজমক গল্প বলা, গায়ক গায়িকা ও নর্তকিদের আসর বসতো। সে আসরে নামী দামী ব্যক্তিবর্গ আমন্ত্রিত হতেন। ফলে আনন্দ উৎসব ও ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাবের ভিতর দিয়ে ঈদ উদযাপিত হতো। মুসলিম শাসন আমলে ঈদ উদযাপন হতো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রজাদের কুশল বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। খাদ্য ও নানা উপহার সামগ্রী বিলিয়ে দেয়া হতো।

ঈদ মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলেও দেড়-দুইশত বছর আগে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না থাকায় বিত্তহীন বা দরিদ্র জনগণ ঈদ আনন্দ উপভোগের সুযোগ পেতো না। আর কোরবানির উল্লেখযোগ্য ঘটনার সমারোহ তেমনভাবে প্রচার ও প্রভাব না থাকায় কোরবানির প্রতি মানুষের তেমন ধর্মীয় অনুভূতি ছিলো না। তখন দুই ঈদের প্রধান আকর্ষণ ও বৈশিষ্ট্য ছিলো মাঠে নামায পড়া ও খাওয়া-দাওয়া। মহররমপর্বে আশুরার দিন জাঁকজমক আয়োজনে উদযাপিত হলেও ঈদে তেমন কিছু হতো না। কারণ হিন্দু প্রভাবের প্রাধান্যের কারণে গরুর পূজা ছিল কোনো কোনো অঞ্চলের উৎসবের অঙ্গ। পৌষ সংক্রান্তি ও বিভিন্ন আয়োজনে পশুর পূজা-অর্চনা করা হতো। ভোরবেলায় গরুকে স্নান

করিয়ে শিং সিঁদুর দ্বারা রঞ্জিত করে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হতো। সে গরু পরমানন্দে মাঠে চরানো হতো। তখন মুসলমানদের মধ্য কোরবানি করার প্রভাব বিস্ড়ার করে নাই। দুইশত বছর আগে বকরা ঈদে ২/৩টা গরু কোরবানি হতো।

ইসলাম চর্চা ও ধর্মীয় জ্ঞান সম্বন্ধে তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের মধ্য জ্ঞানের অভাব তীব্র ছিলো। হাজী শরীয়তউলণ্ঢাহর ফরায়েজি আন্দোলনের ফলে ধর্ম প্রচার ও সংস্কার ঘটতে থাকে। হিন্দু রীতি নীতি যা মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছিলো তার প্রভাব কমতে থাকে। ফরায়েজি আন্দোলনের পর থেকে মুসলমানগণ হিন্দু রীতিনীতির অভিঘাত থেকে বের হওয়ার চেষ্টা চালাতে থাকে। হাজী শরীয়তউলণ্ঢাহর ধর্মীয় আন্দোলনের ফলে ঊনিশ শতকের প্রথম দিকে মানুষের মধ্যে বিশুদ্ধ ইসলাম চর্চা শুরু হতে থাকে। ফরায়েজি আন্দোলনের ফলে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান, প্রচারকের প্রচার ওয়াজ মাহফিল মুসলমানদের মনে ধর্মীয় ভাব ও আগ্রহ শুরু হয়। ঊনিশ শতকেও ধর্মীয় অনুষ্ঠান কোরবানি নিয়ে কোনো প্রকার উৎসাহ মুসলমানদের মধ্যে ছিলো না।

১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে গো হত্যা নিবারণী সভায় পূর্ববঙ্গে কোরবানীর বিপক্ষে প্রচার শুরু হয়। তখন পূর্ববঙ্গে কোরবানীর প্রচলন ছিলো। ১৯২০ শতকের পর থেকে কোরবানীর উপর বিধিনিশেধ কমতে থাকে।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশ বিভাগের পর পাকিস্ড়ান হওয়ার পর থেকে ধর্মীয় গাম্ভীর্য, উৎসাহ উদ্দীপনা ও বিপুল উৎসাহ কোরবানি চলতে থাকে। তখন বিত্তবানদের পক্ষেই কোরবানি দেয়া সম্ভব ছিলো। তখন রমযান খুশির ঈদ তা সাধারণ মানুষ বুঝতো না। দু'বেলা খাবার যোগাড় করাই কষ্টসাধ্য ছিলো। নতুন জামাকাপড়ের কথা বলাই বাহুল্য। তখন ঈদ ছিলো জামাতে নামায পড়া। বর্তমান ঈদের এতো আয়োজন, প্রাণচাঞ্চল্য ও আগ্রহ ছিল না। কোরবানির ঈদ নামায শেষে কোরবানি ও মাংস বন্টনের মধ্য দিয়ে তখন ঈদ সার্বজনীন হয়ে ওঠতো। তৃণমূল পর্যায়ের বিত্তহীনদের মধ্যে মাংস বিলিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে সামাজিক বন্ধন তৈরি হতো।

ইসলাম শব্দের অর্থ হলো আত্মসমর্পণ। কোরবানির পশু বিসর্জনের মধ্য দিয়ে

আলণ্ঢাহর নিকট আত্মসমর্পণের উদ্দেশ্যই হলো কোরবানি। পবিত্র কোরআনে বর্ণিত কোরবানির আদর্শের মূলকথা হলো– আলণ্ঢাহর উদ্দেশ্যে আত্মোৎসর্গ করা। আল- াহর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমপর্ণ করে স্বীয় নফসের পশুত্বকে কতল করার নামই হলো কোরবানি। কোরবানি করা মানবজীবনের পরম ও চরম কর্তব্য। আলণ্ঢাহর প্রেমে ত্যাগ করা, বিসর্জন এবং উৎসর্গ করার নামই কোরবানি। নবী-রসূলগণ সব সময়ই আলণ্ঢাহর প্রেমে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। তাদের মহান ত্যাগের আদর্শকে সমাজে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য আনুষ্ঠানিক কোরবানির প্রয়োজন আছে। সেই উদ্দেশ্যে মহামানবদের আত্মত্যাগের আদর্শকে স্মরণ করে আত্মত্যাগের আদর্শকে বাস্ড়বায়িত করাই হলো কোরবানি।

আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে আলণ্ঢাহপাক তার প্রিয়বস্তু তথা পুত্র ইসমাইলকে কোরবানি করার নির্দেশ দেন। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম পুত্রকে তার স্বপ্নের কথা জানালেন। আলণ্ঢাহভক্ত বালক পিতাকে বললেন, আমি জবাই হয়ে গেলে আলণ্ঢাহ যদি সন্তুষ্ট হন, তা হলে আমি হাসিমুখে আলণ্ঢাহর পথে জবাই হতে রাজি আছি। এভাবেই পিতা যখন আলণ্ঢাহর আদেশ পালনে উদ্যোগী হলেন, তখন মহান আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা এলো, "হে ইব্রাহীম, তোমার কোরবানি কবুল হয়ে গেছে। আমি এখনই বেহেশত হতে একটি দুম্বা প্রেরণ করছি।" আলণ্ঢাহর প্রেরিত সেই দুম্বা কোরবানি করে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আলণ্ঢাহর আদেশ পালন করলেন। এই হৃদয়বিদারক ঘটনার ইতিহাস পিতা-পুত্রের ত্যাগ মহিমা ও আলণ্ঢাহ প্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ড় কোরবানির উৎস।

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম পবিত্র রবের সাথে ওয়াদা পালনের মধ্য দিয়ে কোরবানি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং হক আদায় করেছেন। আলণ্ঢাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আত্মোৎসর্গ করাই হচ্ছে কোরবানি। ১০ই জিলহজ এই বিধানটি পালন করা হয়। বিত্তশালী ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান কোরবানি পালনের মধ্য দিয়ে আলণ্ঢাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য উদগ্রীব হয়। আলণ্ঢাহ ভীতি ও আলণ্ঢাহর নির্দেশ পালনে কে কতটুকু ত্যাগ করতে পারে, আলণ্ঢাহ তা প্রত্যক্ষ করেন। আলণ্ঢাহ বলেন, "আমার কাছে কোরবানির রক্ত, মাংস, হাড় ইত্যাদি পৌঁছায় না, পৌঁছায় শুধু তোমাদের অন্ড়রের তাকওয়া এবং আলণ্ঢাহ ভীতি।"

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তার প্রাণাধিক পুত্রকে মহান রাব্বুল

আলামিনের নামে উৎসর্গ করে আত্মসমর্পণের এক উজ্জ্বল নজির স্থাপন করে গেছেন। আমাদের উচিত তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আত্মত্যাগের পরীক্ষায় আলণ্ঢাহর আদেশ-নির্দেশ ও বিধানকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা।

আজকাল কোরবানির বহুল প্রসার ঘটেছে। আর্থিক সঙ্গতি বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে কোরবানির প্রবণতা বেড়ে গেছে। একটি নয়, বিত্তবানেরা এক-একজন কয়েকটি করে পশু কোরবানি করেন। গলায়, শিংয়ে মালা পরিয়ে পশুকে কতটা আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, তার আয়োজন চলতে থাকে। পশুর দাম কে কত টাকা দিয়ে কিনলো জাহির করা ঠিক নয়। পশু জবাইয়ের পর মাংস বণ্টন ও চামড়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দুস্থদের বিতরণের মধ্যে দরিদ্রদের প্রতি হক আদায়ের সুযোগ রয়েছে। ঈদুল ফিতরের যাকাত আদায়ের মধ্যে দরিদ্রের প্রতি হক আদায়ের সুযোগ রয়েছে। ঈদুল আযহা শুধু মাংস ভক্ষণের উৎসব নয়। মাংস বণ্টনের মধ্যে এক মৌক্ষম বিধান রয়েছে, যা ধনী গরীবের মধ্যে সামাজিক সেতুবন্ধন সৃষ্টি করার উপযুক্ত সময়। সব ভেদ, হিংসা, বিদ্বেষ ভুলে অপরের কল্যাণে নিবেদিত হোক আমাদের জীবন ও মন। কোরবানির পশুর গোশত বণ্টন ও চামড়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ গরীব ও দুঃখীদের বিতরণের মধ্যে যে আনন্দ তাই আলণ্ডাহ রাব্বুল আলামিন গ্রহণ করেন।

বৎসরে দুইবার ঈদ আসে আমাদের জীবনে পরম আনন্দ নিয়ে। এই আনন্দ উপভোগের প্রস্তুতি অনেক সময় আধিক্য হয়ে যায়। পাশের বিত্তহীন পরিবারটির অসহায় অবস্থা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। অধিক ব্যয় কমিয়ে অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ালে ঈদের খুশি সার্বজনীন হয়ে ওঠবে।

ধনী-গরীবের পার্থক্য ভুলে ত্যাগ, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার মহান আদর্শ হলো ঈদ। ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা দুটি ঈদই আমাদের জীবনে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অধিকারী। এর আনন্দ উপভোগ আমাদের জীবনে আলণ্ডাহর অশেষ রহমত বরকত ও সন্তুষ্টিতে ভরে ওঠুক। ঈদ হোক ধনী-গরীবের সবার।

সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি

আজ পহেলা জানুয়ারি ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ। আজ আমি ৬৩ বছরের প্রৌঢ় বৃদ্ধা। গতকাল থার্টিফাস্ট নাইটে সারাদেশে যখন আনন্দ উৎসবের জোয়ার লেগে আছে। পুরাতনের বিদায়, নতুনের সম্ভাষণ। এদিন নাতি-নাতনিরা এক অনাড়ম্বর পরিবেশে আমার জন্মদিন পালন করলো। সে আয়োজনে ঝলমলে বাতির কোনো আলো ছিলো না। ছিলো না কোনো বাহারি খাবারের আয়োজন। ওরা সামান্য কেক কেটেই মুহূর্তটাকে উজ্জ্বল করে তুললো।

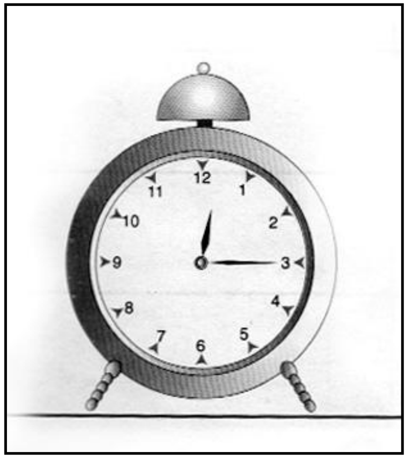

শৈশবের কোলাহল, ছাত্র জীবনের আনন্দঘন পরিবেশ ছেড়ে ১৯৬৬ সনে ঘর বাঁধলাম নব্য স্কুলশিক্ষক ছাদের আলী সাহেবের সাথে। তখন আমি ইন্টারমিডিয়েট পড়ি মুমিনুন্নেসা মহিলা কলেজে, ময়মনসিংহ। বড় ভাই আব্দুল কাদীর, রেভিনিউ সুপার তার অবদান আমার শিক্ষা জীবনকে আলোকিত করেছে। উনার সান্নিধ্য এবং উৎসাহে আমি উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ পেয়েছি। স্বামীর চাকরিস্থল নেত্রকোণায় নতুন সংসার শুর"। সংসার ও পড়ালেখার যৌথ কলেবরে দুই বৎসর কেটে গেলো। নেত্রকোণা ডিগ্রি কলেজ থেকে ডিগ্রি পরীক্ষা দিয়ে স্বামীর বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক বিদ্যালয়ে বদলির সুবাদে টাঙ্গাইল চলে আসি। এ সময় আমি বিএড ভর্তি হই ময়মনসিংহ মহিলা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে। সে এক মজার অভিজ্ঞতা। এখানে বয়স্ক মহিলারা আসেন প্রতিবৎসর শিক্ষা গ্রহণ করতে। আমার স্কুল জীবনের সহপাঠী বান্ধবী ও বিভিন্ন জেলার মহিলাদের সাথে অন্তরঙ্গ পরিবেশে কখন একটি বৎসর পার হয়ে গেলো,

বুঝতেই পারি নি। তখন আমি তিন সন্তানের জননী। প্রতি সপ্তাহে টাঙ্গাইল আসা-যাওয়া, ট্রেনিংয়ের কারিকুলাম শেষ করা- এসব করতে করতেই সময় কেটে গেলো।

ট্রেনিং কলেজের ছাত্রীরা প্রায় সবাই মা, দু'একজন বাদে। হোস্টেল জীবন আনন্দের; কিন্তু মায়েদের জন্য নয়। ছোট ছেলেমেয়ে রেখে মায়েরা ট্রেনিংয়ে আসে। খোলা মাঠে হোস্টেলের বারান্দায় ও পুকুরঘাটে সংসারের আলাপ, ছেলে-সন্তানের জন্য কান্নাকাটি- এ যেন এক বেদনার ছবি। ভূঞাপুরের হেড মিস্ট্রেজ মাজেদা আপা জমজ দুটি সন্তান রেখে ট্রেনিং করলেন।

ট্রেনিং কলেজে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অগ্রণী ভূমিকা আমার ছিলো। সে সব এখন মধুর স্মৃতি। বিএড ট্রেনিং শেষ করে টাঙ্গাইল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে ৩৫টি বৎসর নির্বিঘ্নে কখন যে কেটে গেলো বুঝে ওঠতে পারলাম না। সময় এবং নদীর স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। শিক্ষকতা পেশায় আমি অনেক কাছের এবং অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের পেয়েছি। যাদের সাথে সুন্দর কোলাহলময় দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করেছি। সেখানে সুখস্মৃতি বেশি। শিক্ষকতার পরিপূর্ণ সময় শেষ করতে পেরে আমি তৃপ্ত।

টাঙ্গাইলে পুর্ব আদালতপাড়ায় ভাড়াবাসায় ২/১ বৎসর থাকার পর নিজস্ব জায়গায় মনের আনন্দে ছোট্ট দুটি টিনের ঘর করে যাত্রা শুরু হলো। ছেলেমেয়েরা বড় হলো। লেখাপড়া শেষে ওদের বিয়ে দিলাম। একামাত্র মেয়ে শরীফা ইয়াছমীন শিউলি, মাস্টার্স একাউন্টেন্ট, জামাতা আব্দুল মুত্তালিব, এজিএম, সোনালী ব্যাংক টাঙ্গাইল। বড় ছেলে সোহেল একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ধানসিঁড়ি। মেজো ছেলে শহীদুল্লাহ কায়ছার শিক্ষক, বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়। ছোট ছেলে ক্যাডেট সাইফ জার্মানে অধ্যয়নরত। বড় ছেলের বৌ ডিগ্রি পরীক্ষার্থী। মেজো ছেলের বৌ সহকারী প্রফেসর, করটিয়া সা'দত ইউনিভার্সিটি কলেজ। ছোট ছেলের বৌ প্রফেসর, স্টেট ইউনিভার্সিটি ঢাকা। কর্কট রোগ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ছোট বৌ আমাদের ছেড়ে পরপারে চলে গেলো।
তারপর আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখা শুরু করলাম।

আমার স্বপ্ন অদেখাই রয়ে গেলো।
আমি ভুল করে চাইনি–
যা পেলাম তাতো আমি ইচ্ছা করিনি।

আমার পাওয়া এবং চাওয়ার মধ্য কোনো ভুলত্রুটি ছিলো না। কোনো মানুষেরই পাওয়া এবং চাওয়ার মধ্যে সন্তুষ্টি থাকে না। তবু মানুষ বাঁচে। আমিও অতৃপ্ত মনে তৃপ্তির আস্বাদন ভোগ করছি। সে তৃপ্তিতে না পাওয়ার বেদনাই হাহাকার করে। নিয়তি সবাইকে উপহার দেয় না। কাউকে কাউকে হার

মানায়।

আমি সেই দলের একজন। সাড়ে চারটি বছর, আটটি ঈদ, নববর্ষ ১ লা বৈশাখ, আমার নিকট ঈদের আনন্দ বয়ে আনতো। এখনও ঈদ পার্বণ আসে। সে আনন্দ আমাকে আর আন্দোলিত করে না। আমি অসীম শূন্যতায় কাকে যেন খুঁজে বেড়াই। আমার তিনটি বৌকে আমি অভিন্ন মনে করতাম। ওদের জন্য এবং ওদের নিয়ে আমার যে সংসারযাত্রা চলছিলো তা মাঝ পথে থেমে গেলো। ছোট ছেলের বাসা 'দোলনচাঁপা' হারিয়ে গেছে। আমার একসময়ের সুখ-স্বপ্ন এখন আর মনকে রাঙায় না। আমি নিজের কাছে, নিয়তির কাছে হেরে গেছি। অতি অল্পসময়েই সুখের তরী মাঝপথে ডুবে গেলো আমার সুখপাখিটা খাঁচা ছেড়ে উড়ে গেলো। জীবনযুদ্ধ শেষে অদক্ষ নাবিকের মতো কৌশল খুঁজে ফিরি; কোথায় আমার ভুল ছিলো। ছোট বৌ অকালে চলে যাওয়ায় আমার সংসারে ছন্দপতন ঘটে গেলো।

জীবন সায়াহ্নে এখন অবসর জীবন যাপন করছি। আশা-নিরাশার পালকিতে ভর করে চলছি সমুখের দিনগুলোর কথা ভেবে। অতীত সুখগুলো হাতড়িয়ে মনে মনে তৃপ্তি পাই। সেই যে নেত্রকোণা মুক্তারপাড়ার প্রথম সংসার যাত্রা শুরু। মুক্তারপাড়া একটি অভিজাত এলাকা। অল্পদিনেই পাশের পাড়ির মুক্তার গিন্নি, উকিল গিন্নি, ডাক্তার খালাম্মা, দারোগা নানা-নানি, আমাদের বাড়িওয়ালা শামছ উদ্দিন সাহেব, উনার ফুপু ও ছেলেমেয়েদের সাথে আমার মধুর সম্পর্ক ছিলো। তখন আমি ডিগ্রি ক্লাসে পড়ি। বান্ধবী মনু, শিখার মা, জোবেদা আপা সবার আদর ভালোবাসা কোনোদিন ভুলবো না। ওয়াপদার ইঞ্জিনিয়ার হালিম সাহেব, পশু ডাক্তার আরও যারা টাঙ্গাইলবাসী ছিলেন, আমরা যে কোনো উপলক্ষে সবার বাসায় পালা করে দাওয়াত খেতাম। আঞ্জুমান স্কুলের ছাত্র লাল মিয়া, ওদের বাড়ি দাওয়াত খাওয়াতো। সে দিনগুলো খুব আনন্দের ছিলো। মুক্তারপাড়ার স্মৃতি এখনো মানসপটে জ্বলজ্বল করে। তাদের আন্তরিকতা ও আাদরের কথা ভুলার নয়। ওখান থেকে অনেক শিখেছি ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি।

ডিগ্রি পরীক্ষা শেষ করে স্বামীর চাকরিস্থল বিন্দুবাসিনী সরকারি বালক বিদ্যালয়, টাঙ্গাইলে হেতু আমরা পূর্ব আদালতপাড়া ভাড়া বাসায় ওঠলাম। আমার সংসারটা আগেও ছোট ছিলো না। এখানে আমাদের উভয়ের আত্মীয়-স্বজন, শ্বশুর-শাশুড়ি, আমার মা আমার পড়াশুনা ও বাচ্চাদের দেখভাল করার জন্য থাকতেন। তারপর পঁচাত্তর সনে নিজবাড়ি পূর্ব আদালত পাড়ায় টিনের ছোট

দুটি ঘর করে থাকা শুরু করলাম। ভাতিজা সালাম, নূরুল আমার নিকট থেকে পড়াশুনা করতো। আমার ভাইঝি রীনা কুমুদিনী কলেজে পড়াশুনার সুবাদে এখানেই থাকতো।

ভাগ্নির ছেলে জসিম হূমায়ূন, আমার ভাসুরের ছেলেরা, সালাম, রুহুল, নূরুল, আমার বোনের ছেলে রাজা পর্যায়ক্রমে এখান থেকেই পড়াশুনা করেছে। শিউলির বিয়ের পর ওর ভাগ্নি মেরী আমাদের নাতনি সম্পর্কিত করটিয়া কলেজে পড়তো ও মাঝেমধ্যে এখানে থাকতো। ওর কথা, ব্যবহার, কর্মদক্ষতা সবাইকে আকৃষ্ট করতো। মেরী এখন আমেরিকায় স্বামীর সাথে অবস্থান করছে। আমার এখন বড় ঘর হয়েছে। ছেলে-মেয়ে আলাদা পাকাবাড়ি করেছে। কিন্তু সেদিন ছোট্ট টিনের ঘরে বড় চৌকিতে গাদাগাদি করে থাকার মতো আনন্দ আর মনে হয় না। ভাতিজারা সবাই তাদের কর্মসংস্থান করে যার যার মতো সংসার করছে। ওরা হয়তো কোনো কর্ম-অবসরে ওদের ছেলে-মেয়ের সাথে রূপকথার গল্পের মতো আমার সাথে থাকার কথাটা বলবে।

বিএড ট্রেনিং শেষ করে টাঙ্গাইল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় প্রবেশ করি। সারাদিন কর্মব্যস্ততা শেষে দুজন বাড়ি ফিরতাম। ছেলে-মেয়ে অধীর আগ্রহে আমার জন্য অপেক্ষা করতো। কখনও স্কুল থেকে ফেরার পথে ওদের রাস্তায় পেতাম। তখন নিজেকে অপরাধী মনে হতো। স্কুল থেকে ফিরেই শ্বশুর ও সন্তানদের খোঁজ-খবর নিতাম। বাসার কাজে লেগে থাকতাম অনেক রাত পর্যন্ত। বাড়ির খালি জায়গায় বাগান করা, সবজি লাগানো সবই করতাম। মাটির ঘরদোর লেপা, পাতকূয়ার পানি তোলা, কুপিবাতি জ্বালিয়ে বাসন মাজা সবই করতে হতো। এখনকার মতো আধুনিক সংসার নয়, যাকে বলে গৃহস্থালি। সখ করে ঢেঁকি পেতেছিলাম।

সে সব দিনের কথা এখন গল্পের মতো মনে হয়। সেই যে ছোট্ট নিকানো ঘরদোর। জোছনারাতে উঠানে মাদুর বিছিয়ে গল্প করা এখন আর হয় না। ভাতিজা নূরুল আমিন-রুহুল আমিন সবাই মিলে আমার রান্নার ফাঁকে অনেক হাসির গল্প বলতো। ততক্ষণে ছোটরা ঘুমিয়ে যেতো। আর রাতের খাওয়াই হতো না।

প্রয়োজনের তাগিদেই ছেলেমেয়েরা নিজস্ব বাসাবাড়ি করছে। ওরা এখন ওদের

মতো করেই থাকে। আমরা এখন শুধু দুজন এক কামরাবাসী। সেদিনের কোলাহল থেকে মুক্ত। খাওয়ার টেবিলে তাদের সাথে একত্র হওয়ার সুযোগ

হয়। নাতি-নাতনিরা পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছে। এই যে ব্যস্ততা ওদের জীবন গড়ার তা যেন সত্যি হয়। ওদের জীবন যেন সুন্দর হয়, এটাই কামনা। আমি যেমন চাকরি ও সংসারের আবিলতা সত্ত্বেও ছেলেমেয়ের কথা ভেবেছি, এখনকার মায়েরা আমার চেয়েও সচেতন- এটা ভাবতে ভালো লাগে।

দীর্ঘ সংসার জীবনে আমার কাজের সাহায্যকারী হিসাবে যাদের পেয়েছি তাদের অবদান স্মরণযোগ্য। ফরমাস খাটার জন্য সংসারের শুরুতেই পেয়েছিলাম রহিমা, টুনির মা, আছিয়া ও ভানুকে। ওরা আমার সন্তানদের সাথেই হেসে-খেলে বড় হয়েছে, আমাকে সাহায্য করেছে। আছিয়া মেয়েটা বাড়ি গিয়ে অসুস্থ হয়ে বালিকা বয়সেই মারা গেলো। টাঙ্গাইল আসার পর দত্তগ্রামের ভানু, চম্পা, হাওয়া, মর্জিনা বেশ ক'বছর আমার সংসারে থেকেছে। এ ছাড়া ধনবাড়ির জোহরা, ময়থার বেগম, সখিনা আমার সংসারে বড় হয়েছে।

বর্তমানে আমার একজন রহিমা আছে, আমার সংসার সেই দেখাশুনা করে। আমাদের প্রতি সে খুব আন্তরিক। সেই কবে ৩/৪ বৎসর বয়সের রুবেলকে পেয়েছিলাম। ও এখন ২৬/২৭ বৎসর বয়সের যুবক। আমার সংসারের একজন হয়ে আছে। ওর যত কথা, ভাব ভালবাসা দাবি আবদার আমাকে ঘিরে। আফাজ ছেলেটা কবে থেকে যে আমার সংসারে জড়িয়ে গেছে মনে নেই। তবে ২৫/২৬ বৎসর প্রায় হয়ে এলো; যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে ওকে ডাকলেই পাই। আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে বাসা পর্যন্ত ওর অবাধ বিচরণ। বিয়ে-শাদি থেকে যে কোনো অনুষ্ঠানে আফাজ সকলের মধ্যমণি হয়ে আছে। ওদের গ্রামের বাড়ির প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে আমরা গিয়েছি।

গোপালপুরের নাজমা, মধুপুরের মর্জিনা ওদের নিকট থেকে যে শ্রম ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি, তা কোনোদিন ভুলবো না। ওদের শ্রম অনুযায়ী হয়তো আর্থিক সহযোগিতা করতে পারিনি, তারপরও ওরা তুষ্ট হয়েই থাকতো। সে সময় ভাত-কাপড় ও সামান্য উপঢৌকনে ওরা কত সন্তুষ্ট থাকতো, সেটা এখন উপলব্ধি করি। কারও বাড়িও বেড়াতে গেছি; ওদের সরল মনের আতিথেয়তা আমাকে মুগ্ধ করতো।

ওদের অনেকের সাথেই এখনো যোগাযোগ আছে। ওরা কেউ কেউ আদর্শ গৃহিণী। এতেই আমি তৃপ্তি বোধ করি। ওরা কত অল্পে সন্তুষ্ট থাকতো, সেটা

এখন উপলব্ধি করি। ওদের নিকট থেকে যে আন্তরিকতাপূর্ণ সেবা ও শ্রম

পেয়েছি, তার মূল্য হয়তো আমি দিতে পারিনি। তার মূল্য অর্থে হয় না, ওদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। ওরা ভালো থাক- এটা প্রার্থনা করি।

যে সংসার ঘিরে আমার এতো আয়োজন তা কতটুকু পরিপূর্ণতা পেয়েছে তার সাক্ষী আমি নিজেই। কোনো মানুষই পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে না। চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে তফাৎ থেকে যায়। আমি একসময় ভাবতাম আমার আঙিনার ছোট দুর্বাঘাসটি পর্যন্ড় আমার নিকট অতিপ্রিয়। আঙিনার প্রতিটি স্থানে আমার পদচারণা, হাতের ছোঁয়া পেয়ে সবুজ হয়ে ওঠেছিলো, তা এখন ম্- ান।

একদিন আমার বাড়ির চারপাশে লাউ সীম সবজির বাগান হতো। গাছে গাছে আম ঝুলতো। ইট কংকরের সমাবেশে তার অবসান হয়েছে। মাটির টিনের ঘরের জায়গায় পাকা দালান ওঠেছে। আরও ওঠার পরিকল্পনা রয়েছে।

সংসারযাত্রার কলেবরে আমি শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। আবেগে আপণ্ডুত হই, সমস্যায় জর্জরিত হই, তবু আমি একজন দক্ষ অভিনেত্রীর মতো মঞ্চে অভিনয় করে যাচ্ছি। অন্যরা আমার সহশিল্পী। আমার দুর্বল মুহূর্তে তারাই আমাকে শক্তি সাহস যোগায়। আমার পরিবারের সদস্যরাই আমার মানসিক শক্তি বাড়াতে পারে- এই আশা মনে জাগে।

প্রথম জীবনের স্বপ্নিল দিনগুলোর কথা মনে করে নিজেই নিজের মনে শান্ড় খুঁজে ফিরি।

কর্মজীবন থেকে রেহাই পেলেও সংসার থেকে মুক্ত হতে পারিনি। এ যেন মহান দায়িত্ব। শ্বশুর-শাশুড়ি আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত সংসার সাজিয়ে নানা কোলাহলে জীবন কেটেছে। এখন তারা কেউ নেই। পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে যা চাওয়ার এবং পাওয়ার তার কতটুকু পেয়েছি এর হিসাব করতে চাই না। আমি কতটুকু দিতে পারছি, এটাই অনুভব করি।

বাবা-মা শ্বশুর-শাশুড়ি কেউই নেই। ছেলে-মেয়েরা তাদের সংসার নিয়ে ব্যস্ড়। কারও যেন ফিরে দেখার ফুসরৎ নেই। এইতো জীবন। আমিও একসময় আমার

পরিবারকে নিয়ে এমন ব্যস্ড় ছিলাম। জীবনের শেষ প্রান্ড়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি চাওয়া এবং পাওয়ার হিসাব নাই বা খুঁজে পেলাম। আমার অবস্থানে থেকে আমি তৃপ্ত। যা পেয়েছি তাই বা মন্দ কী?

এসব কোলাহল ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। পিছনে পড়ে রবে শুধু দীর্ঘশ্বাস। কবির কথায়–

সকলি ছাড়িয়া যাবো এ জগৎ পড়ে রবে পিছু

আর আমি এই বিশ্বের দেখিবো না কিছু।

সুন্দর পৃথিবী। এর সৃষ্টির অপরূপ সৌন্দর্য এখনও আমার মনকে আকর্ষণ করে। আরও বাঁচতে ইচ্ছা করে।

নিখিলের এতো শোভা এতোরূপ এতো হাসি-গান

ছাড়িয়া মরিতে মোর কভু নাহি চাহে মন-প্রাণ।।

ফেলে আসা স্মৃতিময় দিনগুলো স্মৃতি হয়েই থাক। আগামী দিনগুলোও যেন আমার জীবনে মধুময় হয়ে ওঠে। আনন্দ আর কোলাহলের মাঝেই যেনো জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৩ই মে 'বিশ্ব মা দিবস' উপলক্ষে মেয়ে শিউলি একগুচ্ছ ফুল ও উপাদেয় খাবার, মেজো বউ বন্যা আনিসুল হকের 'মা' বইটি উপহার দিল। পরম তৃপ্তির আস্বাদনে মনটা ভরে গেলো।

টেলিফোন

'আস্‌সালামু আলাইকুম, মা কেমন আছেন, বাবা কেমন আছে'? এই ফোন কলটি আমি চিরতরে হারিয়েছি। আমার আদরের আমাদের ভালবাসা ও ভালো লাগার মানুষটি মহাকাল ও মায়া মৃত্তিকার অংশ হয়ে গেছে। আমাদের ছোট বৌমা, মায়াময় পৃথিবীর আকাশতলে, আলোর শতদল হয়ে ফুটেছিলে তুমি। বিকশিত না হতেই ঝরে গেলে। ঝরা শিউলির অঙ্গন পাশে স্বর্গদূতের আলিঙ্গনে, মৃত্তিকার কোমল বিছানায় আশ্রয় নিলে তুমি। জগতের আনন্দযজ্ঞে নেই তুমি। পরকাল তোমার আনন্দময় হোক- তোমার জন্যে আমাদের সবার এই প্রার্থনা। তুমি আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তুমি আছো আমাদের মনের আকাশে সন্ধ্যাতারা, শরতের সাদা কাশফুল, হেমন্ড়ের নির্মল

পূর্বাকাশের সোনালি আভা, বসন্ড়ের শিমুল, কৃষ্ণচূড়া আর রাঙা পলাশের সৌন্দর্যমণ্ডিত স্মৃতি হয়ে। বিধিলিপির কাছে মানুষ বড়ই অসহায়। তুমি চার বৎসর কয়েক মাস আমাদের মাঝে ছিলে। দেড়টি বৎসর জীবনের সাথে যুদ্ধ করে হেরে গেলে তুমি। আমরা হারালাম তোমাকে। চাওয়া এবং পাওয়ার হিসাব-নিকাশের উর্ধ্বে চলে গেছো তুমি। রেখে গেছো না ভুলা অনেক স্মৃতি।

আমাদের সংসারে এসেছিলে অল্প সময়ের জন্য। এরই মাঝে সবার মন জয় করেছিলে তুমি। তোমার মোহনীয় আচরণে আমাদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজন সবাই তোমাকে ভালোবেসেছিলো। কিন্তু সে ভালোবাসায় আমরা তোমাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারিনি। মরণব্যাধির ছোবলে আমরা হারালাম তোমাকে। তোমাকে ভুলতে পারবো না। তোমার স্মৃতি ভুলার নয়। স্বপনে শয়নে জাগরণে তুমি আমার, আমাদের মনের মাঝে স্থান করে নিয়েছো। শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি তুমি আন্ড়রিক ছিলে। আমাদের প্রয়োজনের দিকটা তোমার খেয়াল থাকতো।

মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে তোমার বান্ধবী হ্যাপিকে বলেছিলে- মার চাকরি নাই, অবসর। মার হাতে টাকা দেয়া প্রয়োজন। অন্ড়িম শয়ানেও তুমি তোমার শ্বশুরের কোলবালিশখানা আরামদায়ক করার জন্য তোমার মাকে তাগিদ দিয়েছো। মৃত্যুশয্যায় শুয়েও তুমি আমাদের জন্য ভাবতে। মৃত্যুর ঠিক একমাস আগে আমাকে বললে- মা, পরিবারের জন্য আমার অনেক কিছুই করার ছিলো। আমাদের চাকরির টাকা দিয়ে আপনাদের হজে পাঠাতে চেয়েছিলাম। হাসি-খুশি, জেরিন ওদের বিয়ের সময়তো আমি কিছু দিতাম। আমার বিয়ের গহনাগুলো ওদের দিলাম। কাকে কোনটা দিবে তাও বলে দিলে। তোমার মনটা অনেক বড় ছিলো, তাই শ্বশুরবাড়ির প্রত্যেকের জন্য বিশেষ করে আমাদের প্রতি তোমার উপলব্ধি ছিলো অনেক গভীর। আমরা হতভাগা, তাই দীর্ঘদিন তোমাকে কাছে পেলাম না।

অসুস্থ অবস্থায় বিভিন্ন সময় সিঙ্গাপুর গিয়েছো চিকিৎসার জন্য। ওখান থেকে সাদিফ, অনিন্দ্য, হাসি, খুশি, মাহিন, আল আমীন, রাকিব সবার জন্য তোমার গিফট আনতে ভুল হয়নি। তোমার ও আমার পরিবারের প্রত্যেকটা বিষয়ে তোমার খেয়াল থাকতো। আত্মীয়স্বজন, গৃহ পরিচারিকা সবাইকে তুমি তুষ্ট রাখতে। কেমব্রিজ কলেজ, স্টেট ইউনিভার্সিটিতে তোমার সহকর্মীবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রী তোমার আচরণে মুগ্ধ ছিলো। তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলো তোমার কর্মক্ষেত্রের প্রত্যেকটি মানুষ। আমি দেখেছি ল্যাবএইড হাসপাতালের কেবিনে তোমার ছাত্র-ছাত্রী তোমাকে দেখতে এসে কী কান্না! এতোটাই তুমি অর্জন করেছিলে তোমার আচরণে। যতদিন বেঁচেছিলে দিগ্বিজয়ী সম্রাজ্ঞীর মতো অন্ড়র জয় করেছিলে সবার। তুমি চলে গেছো বকুল বিছানো পথে। রেখে গেছো হাজারো স্মৃতি। তোমার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, অনুচ্চ আলাপচারিতায় আমি মুগ্ধ হয়েছি। চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন সময় সিঙ্গাপুর গিয়েছো। সিঙ্গাপুর শহর, হাসপাতাল, ডাক্তার, নার্স, এয়ারপোর্ট, মোস্ড়ফা প- াজা, সিঙ্গাপুর ও শহরের আইনশৃঙ্খলা সবিস্ড়ারে বর্ণনা করতে। তোমার বর্ণনায় এখনো আমি কল্পনায় সিঙ্গাপুর চিড়িয়াখানা, শহর অবলোকন করি।

তুমি ধর্মপরায়ণ ছিলে। নামায পড়তে তোমার কোনো সময় গাফেলতি হতো না। তোমার সংগ্রহে অনেক দোয়া-দরূদের বই থাকতো। দোয়া-দরূদ পড়তে অনেক পছন্দ করতে তুমি। আমি মাথায় ঘোমটা দেয়া পছন্দ করতাম। তাই তুমি ঘোমটা পরতে। ঘোমটার ফাঁকে তোমার খোলা মুখের হাসি আমার খুব ভালো লাগতো। আমি মুগ্ধ ছিলাম তোমার মন ভুলানো নয়ন জুড়ানো

হাসিতে।

তোমার মনোবল ও ইচ্ছাশক্তি ছিলো প্রবল। জটিল অপারেশন ও শারীরিক নানা সমস্যা থাকা সত্ত্বেও বাবা-মায়ের সাথে পবিত্র হজ্জব্রত সমাধা করেছো। মক্কা, মদিনার প্রত্যেকটি পবিত্র স্থান ও দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ শেষে ফোনে আমাকে জানাতে। তোমার বর্ণনায় আমি মুগ্ধ হতাম। আলণ্ঢাহর পবিত্র কাবাঘর ও মদিনায় নবীর রওজা শরীফ তওয়াফ ও জিয়ারত তোমার জন্য চ্যালেঞ্জ ছিলো। তোমার দৃঢ় মনোবলের জন্য তুমি হজের সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে আনন্দের সাথে দেশে ফিরেছিলে। এজন্য আলণ্ঢাহর দরবারে আমাদের হাজার শোকরিয়া। তোমার মা-বাবা তোমাকে হজ করানোর জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, এজন্য তাদের জন্য আমার অশেষ দোয়া থাকবে সবসময়।

তোমাদের নিজ হাতে গড়া ‘দোলন চাঁপা’ বাড়িটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার জন্য তুমি যত্নবান ছিলে। সুস্থ অবস্থায় নতুন বাসাটিকে তোমরা দুজনে মনের মাধুরী মিশিয়ে আধুনিকতায় সাজিয়েছিলে। অসুস্থ অবস্থায়ও তার প্রতি তুমি সজাগ ছিলে। দুর্বল শরীরেও তুমি তার ব্যতিক্রম করোনি। মাঝে-মধ্যে যখন বাসায় আসতে হাঁটতে তোমার কষ্ট হতো; তারপরও আসবাবপত্র দেয়ালে আটকানো ছবিগুলো মুছে রাখতে। শেষ সময়েও টুলে বসে তোমার ড্রেসিং আলমারি নতুন করে সাজালে। তুমি রান্না-বান্না করতে পারতে না। কিন্তু মজাদার রান্না খাবার তোমার খুব পছন্দ ছিলো। তোমার কর্মক্ষেত্রে তুমি পারদর্শী ছিলে। তোমার সহকর্মীরা তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলো।

বসন্তের আগমনে শীতের বিদায় বার্তা বাজছে। সরষে ফুলের হলুদ বিস্তীর্ণ গালিচায় ঢাকা গ্রামের প্রান্তর। সে পথে হাঁটতেই তোমাকে মনে পড়ে যায়। মেজোবৌ বন্যা অস্ফুটস্বরে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো– ফেরদৌসি সরষে ফুল খুব পছন্দ করতো। কোকিলের ডাক, শিমুল, পলাশবিহীন বসন্ত যেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি তোমাকে হারিয়ে অসম্পূর্ণতার গভীর থেকে প্রতিমুহূর্তে তোমাকে উপলব্ধি করি আমরা সবাই। তুমি বেঁচে থাকো সবার অন্তর জগতে।

শেষবার তুমি খুব দুর্বল অবস্থায় সিঙ্গাপুর থেকে ফিরে এলে। তোমার শরীর ক্রমশই শুকিয়ে আসছিলো। কিন্তু তোমার চিরচেনা উজ্জ্বল দন্ত খেলানো হাসি অমলিন ছিলো। হাত-পায়ের শক্তিও লোপ পাচ্ছিলো। মনের দিক থেকে তুমিও ওপারের হাতছানিতে সাড়া দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলে। তোমাদের গায়ে হলুদ ও বিয়ের ছবিগুলো তোমার মামাতো ভাই বাবুকে দিয়ে ওয়াশ করিয়ে নিজ হাতে

এলবামে ভরে আমাকে দিলে। ঐ সময় মৃত্যু ও পরপারের জীবন সম্বন্ধে আমাকে সুন্দর একটি গল্প শোনালে। গল্পটি শুনে আমার মন অজানা আশঙ্কায় ভরে গিয়েছিলো। তখন ভেবেছিলাম আমরা হয়তো তোমাকে হারাতে বসেছি। ‘১০এর ঈদুল ফিতরের ৪/৫ দিন আগে ফোনে তোমার কণ্ঠে সেই চেনাসুর- মা, আসসালামু আলাইকুম। দোয়া করেন, আমি যেন সুস্থ হয়ে নিজের কাজ নিজে করতে পারি। সেদিন ফোনকলে তোমার কণ্ঠ অনেক দুর্বল ছিলো।

শেষের দিকে ড্রইংরুম আর বিছানা ছিলো তোমার বিচরণ ভূমি। হাঁটতে কষ্ট হতো, তোমার মা ও আমার কাঁধে ভর দিয়ে ড্রইংরুম ও বিছানা পর্যন্ত চলাফেরা করতে। শেষের দিকে প্রায় এক মাস বিছানায় ঠাঁই হলো তোমার। ধীরে ধীরে অজানা দেশে পাড়ি দেয়ার প্রস্তুতি। ডিজিটাল পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই সেই অমোঘযাত্রা থেকে নিবৃত্ত করার। ডাক্তার, ওষুধ, আপনজনের ভালোবাসা, সেই মহাশক্তির আলিঙ্গন থেকে ফিরাতে পারেনি। রমযানের ঈদের দুদিন পর ঈদের আমেজ কাটিয়ে না ওঠতেই তুমি এই পৃথিবীর মহাকোলাহল থেকে পরম দয়াময় স্রষ্টার সান্নিধ্যে চলে গেলে। আমরা হারালাম আমাদের আদরের ছোট বৌমাকে। প্রবহমান পৃথিবীর আকাশে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-তারা জেগে আছে, থাকবে। চলমান হয়ে আছে জগৎ-সংসার, থেমে নেই কোলাহল। শুধু তুমি নেই আজ। বাগানে ফুটবে নিয়মিত গোলাপ, জবা, জুঁই, চামেলি, রজনীগন্ধা, হাসনেহেনা, তুমি কোমল কলাবতীর মতো অল্পক্ষণেই ঝরে গেলে।

তোমার গানের কণ্ঠও ছিল সুমিষ্ট। সাদিফ, অনিন্দ্য, হাসি, খুশি জেরিন, আল-আমিন, রাকিবদের সাথে আমার উঠানে বসে গাইতে, ‘ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা’, ‘ও আমার দেশের মাটি’, ‘সখি আজি এ বসন্তে কত ফুল ফোটে’, ‘এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিলো দ্বার’, সেবার যখন টাঙ্গাইল এলে সাদিফ তোমাকে ক্লোজআপ ওয়ানের অনেকগুলো গান শুনালো। তোমার মাথাব্যথা ছিলো; সেদিন ওদের সাথে তুমি গাইতে পারোনি। তুমি টাঙ্গাইল এলে ওরা খুব খুশি হতো।

মনে পড়ে, যেদিন তুমি প্রথম আমার গৃহে এলে
সেজেছিলে তুমি ঝলমলে বেনারসি, লালটিপে
হাতে চুড়ি-বেলোয়ারি, কঙ্কন, পায়ে নূপুরে মৃদ ছন্দ তুলে,
সম্রাজ্ঞীর বেশে প্রবেশ করেছিলে আমার গৃহদ্বারে-
ঝাড়বাতির ঝলমলে আলোয় আনন্দে মেতেছিলো সবাই

এখন অন্ড়রে আছে তোমার দেয়া সুখস্মৃতি, শুধু তুমি নেই।

আমেরিকার ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ভাষায় 'গডের সৃষ্ট কোনো জিনিসকে বেশি ভালোবাসতে নেই। কারণ, তিনি কখন তার সৃষ্টিকে মুছে ফেলবেন, তা তিনিই জানেন; আমরা জানি না।' সন্ড়ান হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিজের উক্তির মাধ্যমেই সান্ড্বনা খুঁজে পেয়েছেন। আমরাও আল- াহর নিকট প্রার্থনা করি, আলণ্ডাহ আমাদের কাছ থেকে তোমাকে তুলে নিয়েছেন। তিনি যেন তোমাকে তার কৃপায় জান্নাতে ঠাঁই করে দেন। দুনিয়ার আনন্দবিলাস, সুখ-ভোগ সবকিছুর উর্ধ্বে তুমি। তোমার পরকাল সুন্দর হোক- এই প্রার্থনা করি।

বৌমা, জীবন পরিক্রমায় তুমি হার মেনেছো। কিন্তু ছোটবড় সকলের মুখে মুখে তুমি জেগে আছো। আমার ব্যথিত মন অন্যদের মাঝে তোমার ছায়া খুঁজে ফিরে। মৃত্যুর কঠিন বাস্ড়বতা তোমাকে ছিনিয়ে নিলেও আমাদের অন্ড়রে তুমি আকাশের সন্ধ্যাতারার মতো উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

বৌমা, এবার আমি একটি ফোনকল থেকে বঞ্চিত হয়েছি। প্রতি বৎসর ঢাকায় বইমেলা শুরু হলেই তুমি আমাকে ফোন করতে- মা, ঢাকায় আসেন। আমি বিভিন্ন ধরনের বই বিশেষ করে ধর্মীয় বই পছন্দ করি। তাই তুমি বারবার আমাকে আমন্ত্রণ জানাতে বইমেলায় ঢাকায় যাওয়ার জন্য। একবার খুব মজা হলো। তুমি, সাইফ, তোমার শ্বশুর, মধুপুরের বুজি, নাতি পলাশ অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন স্টলের বই দেখলাম। আমরা অনেকগুলো বই কিনে ফেললাম। প্রতিবৎসর সাইফ আমাকে কিছু বই কিনে দিতো। আমার সংগ্রহের অনেকগুলো বই ওর দেয়া। এবারের বইমেলা পত্রিকায় অবলোকন করেছি। মনের গভীরে তীক্ষ্ণ কষ্ট বেঁধে রেখেছি। আমার বইমেলায় যাওয়ার ফোনকলটি যে আমি চিরতরে হারিয়ে ফেলেছি। আর কেউ কোনোদিন ফোন করে আমাকে বলবে না- 'মা, ঢাকা আসেন- বইমেলা শেষ হয়ে যাবে।'

ঈদুল ফিতর

রমযান মাসের ৩০ টি রোযা পালনের পর শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে মুসলিম জাহানে যে আনন্দ উৎসব পালিত হয়ে থাকে, তা ঈদুল ফিতর নামে অভিহিত। দীর্ঘ একমাস সংযম সাধনার পর সারা দুনিয়ার মুসলমান উপবাস ব্রত হতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এই উপলক্ষে পহেলা শাওয়াল আনন্দ উৎসব পালিত হয়ে থাকে বলে এর নাম ঈদ-উল ফিতর। ঈদ মানে আনন্দ, ফিতর শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা। হযরত মুহাম্মদ সাল- াল- াহু আলাইহিস সালাম মদিনায় হিযরত করতে গিয়ে দেখতে পান মদিনায় তখন পারসিকদের প্রভাবে শরতের পূর্ণিমায় 'নওরোজ' উৎসব এবং বসন্ড়ের পূর্ণিমায় 'মিহিরজান' উৎসব পালিত হয়ে থাকে। এই দুটি উৎসবের রীতি-নীতি ইসলামের জাতীয় রীতি-নীতির পরিপন্থী ছিলো বলে নবী করিম (সা.) এতে মুসলমানদের যোগদান হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দেন। তার পরিবর্তে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এই দুটি উৎসব পালনের রীতি-নীতি প্রবর্তন করেন। সেই থেকে এখন পর্যন্ড় মুসলমানদের মধ্যে বৎসরে দুইবার এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন চলে আসছে। দুই ঈদ ব্যতীত যেমন পহেলা বৈশাখ বা নববর্ষ ও অন্যান্য যে উৎসব পালন করা হয়, ইসলামের দৃষ্টিতে তার কোনো ভিত্তি নেই। ঈদ ব্যতীত অন্য সকল উৎসব বিজাতীয় বেহুদা ও আপত্তিজনক। ইসলামের আগমনের পূর্বে জাহেলিয়াতের যুগে মদিনায় খেল-তামাশা ও আনন্দ উৎসব পালিত হতো। আলণ্ডাহতালা এই দুটি দিনের পরিবর্তে নবী (সা.) কে দুটি উৎকৃষ্ট দিন ধার্য

করে দেন। একটি ঈদুল ফিতর, অপরটি ঈদুল আযহা। এ দুটি উৎসবই মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাতীয় উৎসব।

ঈদুল ফিতরের উৎসবের আনন্দ ও তাৎপর্য আলাদা। রমযান মাসের ৩০টি রোযা পালনের মাধ্যমে আলণ্ঢাহ পাক বান্দার ধৈর্য ও সংযমের পরীক্ষা নেন। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরব অর্জনের পুরস্কারস্বরূপ আসে ঈদুল ফিতর। রোযা পালনের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে সিয়াম সাধনায় পবিত্র করে। যাকাত আদায়ের মাধ্যমে গরীবের হক আদায় হয়। নিজের কৃতকর্মের জন্য আলণ্ঢাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে নিজেকে সোপর্দ করে বান্দা গুনাহ্ থেকে মুক্ত হয়। এই ঈদের দিনে দয়ালু আলণ্ঢাহ রোযাদারদেরকে ক্ষমা করে দেন। তাদের কৃত সকল পাপকে পূণ্যে পরিণত করেন। রসুল (সা.) বলেছেন, ঈদুল ফিতরের দিনটি পুরস্কারের দিন, গুনাহ মাফের দিন। তিনি আরো বলেন, ঈদুল ফিতরের দিন যখন মুসুলিণ্ঢগণ নামায পড়ার জন্য ঈদগাহে রওনা দেন, তখন ফেরেশতাগণ রাস্ড়ায় দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেন, তোমরা রোযা রেখেছো, দান করেছো, আজ তার পুরস্কারের দিন, গুনাহ মাফের দিন। ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করে আলণ্ঢাহ বলেন, ‘দেখো, নামাযীরা কিভাবে আমার দিকে ছুটে ছুটে এগিয়ে আসছে। তোমরা বলে দাও, ‘আমি আলণ্ঢাহর তরফ থেকে রহমত মাফফেরাত ও নাযাতের সুসংবাদ দিলাম।’ নামাযীরা যখন তাকবির বলতে থাকেন, আলণ্ঢাহর ফেরেশতারাও তাদের সাথে সামিল হয়ে যান। ঈদগাহের ময়দানের অপরূপ শোভা কাতারবন্দী নামাযী একইসঙ্গে র্ক্তু সেজদা-এ যেন এক অপূর্ব দৃশ্য! কবির ভাষায়-

আলণ্ঢাহু আকবার ধ্বনিতে মুখরিত চারদিক
ফেরেশতারা জানায় সংবর্ধনা নামাযীকে
আজ ঈদুল ফিতর আজ খুশির ঈদ
ধনী-গরীবের নাই প্রভেদ
আজ খুশির ঈদ।

একমাস রোযা পালনের মধ্যে দিয়ে ঈদুল ফিতর আমাদের জন্য আনন্দের বার্তা নিয়ে হাজির হয়। ছোটরা নামায শেষে দল বেঁধে বড়দের সালাম করে সেলামি পেয়ে খুশি হয়। যাকাত ও ফেৎরা আদায়ের সুযোগ এই রমযান মাসে। ধনী-গরীবের একাত্ম হওয়ার সুযোগ করে দেয় মাহে রমযান। যাকাত ও ফেৎরা আদায়ের মধ্য দিয়ে গরীব ও বিত্তহীন মুসলমান ঈদের আনন্দ করার সুযোগ পায়। এটা শুধু ইসলামেরই একটি গুর্ত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। রোযা ও যাকাত উভয়ের গুর্ত্ব অপরিসীম। নিজের ধনসম্পদের একটা অংশ গরীবদের মধ্যে বিতরণ করলে যাকাত আদায় হয়ে যায়। এতে মাল ও সম্পদের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধি লাভ হয়ে থাকে। ইসলাম শান্ড়ির ধর্ম, ইসলামের বিধান চিরায়ত। এতে দরিদ্র ও ধনীদের মধ্য ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হয়। ধনী-গরীব

এক কাতারে সামিল হয়ে নামায আদায়ের মধ্যে সাম্য-মৈত্রীর বন্ধন ও সৌহার্দ্যের অপূর্ব দৃশ্য এই ঈদুল ফিতর। ঈদের আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে মানবতার কবি, প্রেমের কবি, আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজর্ল ইসলাম বলেন,

ও মন রমযানের ঐ রোযার শেষে
এলো খুশির ঈদ।
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে
শোন, আসমানী তাগিদ।

ঈদের আনন্দ যেমন ধর্মীয় গাম্ভীর্যে ভরপুর, তেমনি আনন্দ ও ইসলামী সংস্কৃতিতে উজ্জ্বল। ঈদুল ফিতরের উৎসবের আনন্দই আলাদা। ঈদ মানেই মেহেদি রাঙানো হাত, কেনাকাটার ধুম, শেষ রমযানের পশ্চিমাকাশে ঈদের চাঁদের জন্য অপেক্ষা করা। এসবই আলাদা আনন্দ বয়ে আনে। প্রথম রমযানের আগে যেমন চাঁদ দেখার জন্য অপেক্ষা করা। শেষ রমযানে ঈদের চাঁদ খুঁজে বেড়ানোর আগ্রহ, সবই আলণ্ঢাহর হুকুম পালনের মধ্য দিয়ে মুসলিম জাহানের বান্দার পরীক্ষা নেন স্বয়ং আলণ্ঢাহ। আমাদের ছোটবেলার ঈদের কথা মনে পড়ে। ২৯ রোযার দিন সবাই আশা করলো আজ ঈদের চাঁদ ওঠবে, কাল ঈদ হবে। কিন্তু ঈদের চাঁদ দেখা গেলো না। পরেরদিন সবাই রোযা রাখলো, এমনও হয়েছে, ত্রিশটি রোযা রাখার জন্য সবই সেহেরি খেয়েছে, পরের দিন সংবাদ এলো আজ ঈদ। তখন এতো সংবাদ মাধ্যম, এতো রেডিও টেলিভিশন ছিলো না। তাই এখনকার মতো ঘরে ঘরে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো খবর পাওয়া যেতো না। এখন আমরা ঘরে বসেই রমযানের চাঁদ ও ঈদের চাঁদের খবর পেয়ে থাকি। ঈদ এবং মেহেদি দুটি শব্দ আমাদের সংস্কৃতির সাথে জড়িয়ে আছে। ছোট বড় সবাই মিলে মেহেদিতে হাত রাঙাতো। ২৭ রোযার দিনে মেহেদি পাতা কুড়ানোর ধুম পড়ে যেতো। পশ্চিম বাড়ির খুকি বুজি, সুরিয়া, আয়েশা, আমাদের বাড়ির জমিলা, আলম ও আমি-সবাই মিলে মেহেদির পাতা কুড়াতাম। বিকালে পাতা বেটে রাখতাম, রাতের খাবার আগে-ভাগে খেয়ে হাতে মেহেদি রাঙানো শুর্ করতাম। এক এক করে সবার হাতে মেহেদি পরাতে অনেক সময় লেগে যেতো। বিপত্তি হতো জমিলাকে নিয়ে। ওর কোনো নকশাই পছন্দ হতো না। রাগ করে গাল ফুলিয়ে চুপটি করে বসে থাকতো। সবার হাতে মেহেদি লাগাতে অনেক রাত হতো, তখন আমার হাতে মেহেদি মাখানোর ধৈর্য থাকতো না। আমার মনের যত নকশা, একত্র করে দুই হাতে ডলে হাত রাঙাতাম। তাতেই পরম তৃপ্তি পেতাম। কোনো ঈদে মেহেদি পাওয়া না গেলে, এক পয়সার আলতার গুটি ও চারআনার তরল কল্যাণী আলতা হাত-

পায়ে লাগাতাম। নতুন জামা-কাপড় পরে দল বেঁধে বেড়াতে যেতাম। এখন মেহেদির জন্য আর কষ্ট করতে হয় না। বাজারে টিউব মেহেদি আর বাহারি কসমেটিক্স দিয়ে মেয়েরা উজ্জ্বল করে সাজগোজ করে। তাতেও যেন কেউ আমাদের মতো তৃপ্ত হয় না। ঈদুল ফিতরের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো- হাতে কাটা সেমাই। আমার মায়ের হাতে দুধ-সেমাইয়ের ক্ষীর খুব মজাদার হতো। সকালে ভাইয়েরা ক্ষীর খেয়ে ঈদের জামাতে যেতেন, দুপুরে মাংস খিচুড়ি খাওয়া হতো, বিকালে আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীকে আপ্যায়ন করা হতো। আমার মা বিশেষ কিছু লোককে খাওয়াতে পেরে তৃপ্ত হতেন। তাঁরাও মায়ের হাতের রান্না খাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করতো। পাড়া-প্রতিবেশী নাতি-নাতনিদের জন্য মা আলাদা খাবার তুলে রাখতেন। ঈদের দিনে আমরা ছোট ছোট মেয়েরা বেড়াতে যেতাম। এখনকার ছেলে-মেয়েরা কয়েক সেট করে জামা-কাপড় পেয়েও তুষ্ট হয় না, আমাদের ‘গাবগাইছা বাড়ির’ হাছেন ঈদের দিন পুরাতন একটি লুঙ্গি পরতো, আর নতুন লুঙ্গিটা গায়ে জড়িয়েই তুষ্ট থাকতো। আমাদের সেকালে কাপড় ইস্ত্রি করার কোনো বালাই ছিলো না। ঈদের জন্য আমরা কাঁসার বাটিতে কয়লার আগুন তুলে হাত দ্বারা ডলে ইস্ত্রি করতাম।

আমার বাবা ঈদের জামাতে নামায পড়াতেন। বাবা আচকান পাগড়ি পরিধান করে লাঠি হাতে সবার আগে জামাতের জন্য বের হতেন। বাবাকে তখন খুব সুন্দর দেখাতো। আলণ্ডাহু আকবর, আলণ্ডাহু আকবর তাকবির পড়তে পড়তে নামাযের মাঠে পৌঁছতেন। নামাযের শেষে খুতবা ও মোনাজাতে বাবা কেঁদে বুক ভাসাতেন। নামাযীরাও আবেগে আপণ্ডুত হয়ে কেঁদে বুক ভাসাতেন।

সে সময় ঈদের দিনে পাড়ার যুবসমাজ নানা ধরনের উৎসবের আয়োজন করতো। আমরা ছোটরা বিকালে হা-ডু-ডু ফুটবল বা নৌকাবাইচ দেখতে যেতাম। নৌকার মধ্যে বৈঠার তালে তালে নাচ, গান চলতো বাবড়ি চুল দুলিয়ে। মাথার চুল ঝাঁকিয়ে গান করতো-

নৌকা চলে কি চলেরে চল
না চলিলে ভাইঙ্গা করমু তল ॥

প্রতিযোগিতা শেষে খাওয়ার আয়োজন হতো। এখনও কোনো কোনো এলাকায়

ঈদের এই বৈশিষ্ট্য বজায় আছে। ইসলামের শিক্ষা সাম্য মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব। ঈদুল ফিতরের ময়দানে ধনী-গরীব সকলে এক কাতারে নামাযে শামিল হয়। এটা যেন এক অপূর্ব সৌহার্দ্য রচনা করে। ধনী-গরীবের ব্যবধান ভুলে গিয়ে সবাই এক কাতারে শামিল হয়ে একাত্ম হয়ে যায়। সে দৃশ্য কতই না সুন্দর!

কবির ভাষায়-

কী অপূর্ব শোভা ঈদগাহ ময়দানের
নাযায শেষে বক্ষ মিলিয়ে লক্ষ নামাযী
করে কোলাকুলি
নাই প্রভেদ ধনী-গরীবের
এই তো মহান শিক্ষা ইসলামের।
মহামিলন স্থান ঈদগাহ ময়দান।

কোরবানির গরু

কোরবানির ঈদের মাত্র দুইদিন বাকী। আমরা যারা ভাগে কোরবানি দেই, সবারই সামর্থ্য একরকম না থাকায় 'গরু না ছাগল' কল্পনা-জল্পনা করতে করতেই কোরবানির ঈদ প্রায় এসে গেলো। মধ্যবিত্তের জন্য সাধ ও সাধ্য এক হয় না। তারপর কেনাকাটার ঝক্কিঝামেলা, টাকার যোগাড়, হাটবাজার দরদাম, ব্যবসায়ী ও দালালদের তোড়জোর মধ্যবিত্তের সাধ-সাধ্যের বাইরে দৌড়ে বেড়ায়। তবুও কোরবানির ঈদ বলে কথা! ছেলে-সন্তানের আবদারের মুখে অভিভাবক কোরবানি হয়ে যান। শুধু তো গরু কেনাই নয়, তার সাথে দুধ চিনি সেমাই ময়মসলা ইত্যাদি কিনতেই টাকা শেষ। তারপরেও ধর্মপ্রাণ মুসলমান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও পশু কোরবানি দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চান। আমরা পাড়ার ক'জন মিলে প্রতিবছর কোরবানির আয়োজন করি। গরু কেনার দায়িত্বটা আমাদের উপরই বর্তায়।

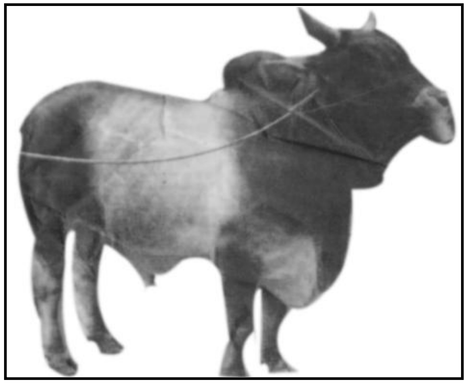

আমার সাহেব ছাদের আলী স্যারের এলাকায় যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। তিনি নাকি গরু কেনায় পারদর্শী। সেই ছিয়াত্তর সনের ঘটনা। পাড়ার সবাই গরু-ছাগল কেনায় ব্যস্ত। অনেকেই লাল, সাদা, কালো রঙের গরু কিনে ফেলেছেন। স্যার কিন্তু হাট যাচাই না করে গরু কিনবেন না। অয়নাপুর, তোরাপগঞ্জের হাট , জুগনীর হাট, এলেঙ্গা-করটিয়ার হাট যাচাই করে তবে গরু কিনেন। আমরা এলাকার কয়েকজন মিলে ভাগে কোরবানি দেই। খালিদ, আব্দুল্লাহদের গরু কেনা হয়ে গেছে। আমরা মঞ্জুরা, লাকি-আরিফরা সবাই মিলে একসাথে কোরবানি দেই। এটা বেশ কয়েক বৎসর যাবৎ চলে আসছে। পরবর্তীতে এই সংগঠনটি ঈদুল আযহার বড় একটা যোগসূত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

স্যারের উপর গরু কেনার দায়িত্বটা তিনি নিজেই উৎসাহের সাথে গ্রহণ করেছেন। তার ছোটবেলায় গরু পোষার নেশা ছিলো। ষাঁড় গরু ও দুধাল

গাভী তিনি পুষতেন। হাইস্কুলে পড়ার সময় স্কুলের আগে-পরে তিনি গরুর খেদমত করে ও মাছ ধরে সময় কাটাতেন। লেখাপড়া শেষে চাকরি জীবনে শহরে চলে আসায় গরুর খেদমত থেকে তিনি বঞ্চিত হন। তবে কোরবানির ঈদের বেশ কদিন আগে থেকেই গরু কেনার তোড়-জোর শুরু করে দেন। তার এই অতিউৎসাহের জন্যই অন্যান্য ভাগিগণ তাঁর উপর দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন। কালের পরিক্রমায় অনেকেই আমাদের সাথে না থাকলেও লাকির আম্মা আপা আমাদের কোরবানির সাথে সাথী হয়ে আছেন। নতুন ভাগিদারও জুটেছে।

কোরবানির ঈদ এলেই আমার একটি ঘটনা মনে পড়ে। প্রায় ৩০-৩৫ বৎসর আগের একটি নাটকীয় ঘটনা। সেবার স্যার কোনো হাটেই গরু কেনা পরতায় ফেলতে পারলেন না। আমাদের ছেলেরা সোহেল, সুমন, বাবলু, লিটন, খোকন, বজলু অতিউৎসাহী হয়ে গেলো হাটে যাবার জন্য। অমুকেরা সুন্দর গরু কিনেছে, তমুকেরা বাহারি খাসি কিনেছে। এসব তথ্য মুখে মুখে চলতে থাকলো। স্যার কিন্তু জুগনীর হাট ও তোরাপগঞ্জের অয়নাপুর হাট থেকে গরু কিনতে ফেল মেরেছেন। এজন্য ছেলেরা বিরক্ত। অমুক গরুটা দেখতে ভালো ছিলো। তমুক গরুটা উচ্চতা ও লম্বায় ভালো ছিলো। ওই গরুটা কেন কেনা হলো না। স্যার চুপ মেরে থাকেন। স্যারের ইচ্ছা আসলে করটিয়ার হাট। ওখানে অনেক গরুর আমদানি হবে। ওখান থেকেই গরু কিনবেন। ঈদের মাত্র দুইদিন বাকী।

পাশের বাড়ির বাবলু-বজলু, আমার ছেলে সোহেল-সুমন মিলে সাড়ম্বরে স্যারের সাথে বরাবরের মতো এবারও গরু কিনতে হাটে গেলো। তখন টাঙ্গাইল বেবিস্ট্যান্ডে গরুর হাট হতো না। একমাত্র হাট করটিয়া, সেখান থেকেই গরু কিনতে হবে। হয় ঠকা, নয় জিতা। বিশাল হাট, স্যার ছেলেদের সাথে নিয়ে হাটের একমাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত গরু যাচাই করলেন। একটা গরু দরদামে চেহারা-সুরতে পছন্দ হয়ে গেলো। গরুর মালিকের বাড়ি ক্ষুদিরামপুর। ছেলেরা গরু পেয়ে খুশি। কেউ মাথায় হাত দিয়ে, লেজ ধরে গরুর সাথে সখ্য গড়তে চেষ্টা করতে লাগলো। বাড়ি ফেরার পালা। গরুটা নিয়ে ছেলেরা যখন বাসার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে উদ্যত হলো বিপত্তি বাঁধলো তখনি। অপরিচিত লোকের সাথে সে আসতে নারাজ। শেষে সাব্যস্ত হলো- মালিক গরুটা টাঙ্গাইল বাসায় পৌঁছে দিবে। গরুর মালিকের সাথে তার কিশোর বয়সের ছেলে, সাথে থাকবে বাবলু ও বজলু।

সোহেল সুমন লেনিন ছোট বিধায় ওরা স্যারের সাথে বাসে চলে এলো। আসার সময় স্যার বজলু-বাবলুকে কুশাইল ও জিলাপি কিনে দিলেন। তোমরা খেতে

খেতে গরু নিয়ে আসো। মালিক ছেলেকে সাথে নিয়ে পূর্ব আদালতপাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দিলো। কথা হলো নগর জলফৈ হয়ে সোজা পশ্চিম দিকে সিও অফিস ও বোয়ালী হয়ে গোডাউন পার হলেই বাসায় পৌঁছে যাবে। গরুর মালিক রওনা দিলো।

এদিকে বাবলু বজলু জিলাপি-কুশাইল খেয়ে তবেই রওনা দিলো। ততক্ষণে গরুর মালিক তার ছেলেকে সাথে নিয়ে অনেকদূর আসলো। বাবলু-বজলুর পাত্তা নাই। গরুওয়ালা ভাবলো ওরা এসে যাবে। স্যার আবার আলাপী মানুষ। গরুর দরদাম করার সময়ই বাসার পরিচিতি যেমন ফায়ার সার্ভিস অফিস, করটিয়া পুকুর পাড়, মুসলিম স্যার সম্বন্ধে গরুওয়ালাকে অবহিত করেছিলেন।

হাট থেকে ঢাকা-টাঙ্গাইল রোডে গরু বাসের হর্ন শুনে লাফালাফি করতে থাকলো। তখন এতো রাস্তাঘাট ছিলো না। গ্রামের গরু, তাই গাড়ির শব্দে ভীত হয়ে মালিকের সাথেও অচেনা পথে আসতে চাইছিলো না। গরুর ছটফট ও লাফালাফি সামাল দিতে অনেক সময় চলে গেলো। বাপ-বেটা মিলে বেগতিক দেখে পাকা রাস্তা থেকে নেমে মাটির পথ ধরে আসার সিদ্ধান্ত নিলো। এতো সময় পার হলো- বাবলু-বজলুর দেখা নেই । ওদের অপেক্ষা না করে গরুওয়ালা এগোতে থাকলো।

বেশ কিছুদূর আসার পর গরুর মালিক ওদের না পেয়ে চিন্তায় পড়ে গেলো। এদিকে বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা হলো।

আমি গরুর জন্য পথ চেয়ে বসে আছি। অন্যান্য ভাগিগণ খোঁজ-খবর নিতে থাকলো গরু আসছে কিনা । কেউ কেউ গরু দেখতে এসে ফিরে গেলো। স্যার ছেলেদের নিয়ে বাসায় পৌঁছেছেন। সোহেল সুমন গরুর জন্য খড়-ঘাস সংগ্রহে ব্যস্ত। ওরা পথ চেয়ে বসে রইলো কখন গরু আসবে।

বাবলু-বজলু গরুর মালিককে না দেখে হাঁটতে হাঁটতে উত্তর-দক্ষিণ, পশ্চিম দিকে নজর দিতে দিতে এগোতে থাকলো। কোথাও কেউ নেই। গরুর মালিকও রাস্তায় গাছের সাথে গরু বেঁধে ওদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলো। ওদের না পেয়ে সন্ধ্যা হওয়াতে গরু নিয়ে নিজ বাড়িতে চলে

গেলো। এদিকে গরুওয়ালাকে না পেয়ে বাবলুরা মহাচিন্তায় পড়ে গেলো। ওরা বলাবলি করলো- আমাদের এতো দেরি করা ঠিক হয়নি। স্যার আমাদের এতো বড় একটা দায়িত্ব দিলেন, আর আমরা কিনা গাফেলতি করে তা পালন করতে পারলাম না। বাবলু বেশ আবেগপ্রবণ। ও প্রায় কেঁদেই ফেললো। বজলু ভাই, এখন কি হবে?

বজলু: চিন্তার কারণ নাই, একটা উপায় বের হবেই।

বাবলু: কোথাও গরুওয়ালাকে দেখছি না।

বজলু: একটা উপায় বের করো, বাসায় গিয়ে কি বলবো?

বাবলু: আমার মাথা ঠিক নাই। যা করার আপনি করেন।

বজলু: বাসায় গিয়ে দু'জনে একই কথা বলবো। আমাদের কেনা গরুটা চোরাই মাল ছিলো । আনার পথে আসল মালিক আমাদের মারধর করে গরুটা ছিনিয়ে নিয়েছে। এই পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে ওরা বাসায় ফিরে এলো।

যেই কথা সেই কাজ। আমরা সবাই গরুর অপেক্ষায় অধীর আগ্রহে বসে আছি। তাদের দু'জনকে দেখে বাবলুর মা আপা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- কিরে, গরু কই? একথা শুনে দু'জনে হাউমাউ করে কেঁদে ঘটনা বললো। সাথে সাথে ফলাও করে প্রচার হলো- স্যার চোরাই গরু কিনেছিলেন। গরুর আসল মালিক গরু ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। বড় লজ্জার কথা! ওদের বর্ণনায় স্যার বিচলিত হলেন। ভাগিরা নানা কথা বলতেও ছাড়লেন না। কুকথা বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এত টাকার গরু কিনা খোয়া গেলো। কেউ কেউ বললেন- ছেলে-ছোকরাদের হাতে গরুর দায়িত্ব দেয়া ঠিক হয় নাই। এখন উপায়? ঈদের একদিন বাকী। সামনে আর হাটও নাই। রাতে আমাদের ঘুম হলো না।

এদিকে হলো কি! গরুওয়ালা বাবলু-বজলুর দেখা না পেয়ে সন্ধ্যা হওয়াতে গরু নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলো। তখন মুঠোফোনের ব্যবহার না থাকায় গরুওয়ালা স্যারের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি। সে বুদ্ধি করলো রাত পোহালেই গরু বাসায় পৌঁছে দিবে। বাবলু- বজলু একসাথেই চলাফেরা করতে লাগলো, হঠাৎ যদি একজন ওদের ফন্দির কথা বলে ফেলে। ওদের চেহারা বিমর্ষ হয়ে গেলো।

গরুওয়ালা সৎলাক। তার যেন আর রাত পোহায় না। ভোরবেলা ওঠেই ছেলেকে সাথে নিয়ে টাঙ্গাইল আদালতপাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে ৯টা-১০টার মধ্যে গরু নিয়ে স্যারের দেয়া ঠিকানামতো বাসায় পৌঁছে গেলো। এ খবর সাথে সাথে চাউর হয়ে গেলো স্যার গরুটা ফিরে পেয়েছেন। তার দুশ্চিন্তার

অবসান হলো। বাবলুর মা ছেলেদের সাজানো নাটকের জন্য খুব অনুতপ্ত হলেন। তিনি স্যারকে বললেন- ভাই, এই বেত দিয়ে পিটিয়ে ওদের শায়েস্ড়া করুন। স্যার গরু ফিরে পেয়েই খুশি। শিক্ষক মানুষ, ওদের দু'কথা শুনিয়ে জীবনে আর এরূপ বানোয়াট কথা না বলার প্রতিশ্রুতি করালেন। খবর হয়ে গেলো স্যারের গরু বাড়ি ফিরেছে। ভাগিরা এসে গরু দেখে খুশি হলো। সোহেল-সুমন গরুর আপ্যায়নের জন্য লতা-পাতা ঘাস আনতে ছুটে গেলো। গরুটা সবার পছন্দ হয়েছে। যেমন নাদুসনুদুস, তেমনি গায়ের রং। দামও সহনীয়, সবার মনে ঈদের আনন্দ ফিরে এলো। গরুওয়ালাকে আপ্যায়ন করে কিছু টাকা বকশিস দিয়ে স্যার বিদায় দিলেন। আমি গরুটার জন্য খড়-পানির ব্যবস্থা করতে ব্যস্ড় হয়ে পড়লাম। একরাতের জন্য হলেও গরুটার সেবা করার সুযোগ পেলাম। কাল কোরবানির ঈদ।

কারবালা

আরবি বৎসরের প্রথম মাস মহররম। এ মাসের একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মহররম শব্দের অর্থ নিষিদ্ধ বা পবিত্র। অর্থাৎ এ মাসে কোনোরূপ ঝগড়া বিবাদ বা যুদ্ধ-বিগ্রহ শরীয়তে নিষিদ্ধ। তাই এই মাসটিকে মহররম মাস বলা হয়। রসূল সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহিস সালাম এই মাসে কাফের, মুশরিকদের সাথে কখনও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হননি। এই মাসের একটি শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হলো দুনিয়ার অসংখ্য উলেণ্ঢখযোগ্য ঘটনা এই মাসে সংঘটিত হয়েছে। এই মাসের ১০ তারিখ ইহলৌকিক উলেণ্ঢখযোগ্য দিনসমূহের অন্যতম। মহররমের তারিখকে 'ইয়াওমে আশুরা' বলা হয়। এই দিনটি বহু সম্মানিত। আশুরার দিনের উলেণ্ঢখযোগ্য ঘটনা:

১। মহররমের তারিখ অর্থাৎ আশুরার দিন আলণ্ঢাহ পাক লওহে মাহফুজ, যাবতীয় প্রাণিকূলের প্রাণ সৃষ্টি করেছেন। আলণ্ঢাহর হুকুমে এ দিনেই পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে।

২। পৃথিবীর নদ-নদী-পাহাড় পর্বত সাগর-মহাসাগর এদিনেই আলণ্ঢাহ সৃষ্টি করেছেন।

৩। আশুরার দিনেই আলণ্ঢাহপাক হযরত আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন। এই তারিখে তার তওবা কবুল করেছেন এবং পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।

৪। আশুরার দিনে আলণ্ঢাহ পাক হযরত নূহ আলাইহিস সালামকে মহাপণ্ঢাবন থেকে নাজাত দিয়েছেন।

৫। এদিনেই আলণ্ঢাহতায়ালা হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আগুন থেকে রক্ষা করেন।

৬। আশুরার দিনে হযরত মুসা আলাইহিস সালামকে ডেকে তুর পর্বতে আলণ্ঢাহ কথা বলেছেন। এদিনেই ফেরাউন কুলজুম নদীতে ডুবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিলো।
৭। হযরত ইউনূছ আলাইহিস সালামকে এদিনেই আলণ্ঢাহ পাক মাছের উদর থেকে উদ্ধার করেন। এদিনেই হযরত আইয়ুব নবীকে কঠিন রোগ থেকে মুক্তি দান করেছেন।
৮। এদিন দাউদ আলাইহিস সালামের গুনাহ মাফ হয়েছিলো এবং হযরত সুলায়মান আলাইহিস সালণ্ঢাম পুনরায় রাজত্ব ফিরে পান।
৯। এই আশুরার দিনে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে আগমন করেছেন। এদিনেই তাকে আলণ্ঢাহ পাক আসমানে তুলে নেন।
১০। এই আশুরার দিনেই আখেরী নবী হযরত মুহম্মদ সালণ্ঢালণ্ঢাহু আলাইহিস সালামের প্রাণপ্রিয় নাতি হযরত ইমাম হোসাইন রাদি আলণ্ঢাহ আনহু পরিবার-পরিজন, সঙ্গী সহচর ও অনুসারীগণসহ কারবালা মর”প্রান্ড়রে নির্মমভাবে শাহাদত বরণ করেন।
১১। সর্বশেষে আলণ্ঢাহ পাকের নির্দেশ অনুযায়ী মহররম মাসের ১০ তারিখ ফেরেশতা ইস্রাফিল শিঙ্গা ফুঁক দিবেন, তখন কেয়ামত সংঘটিত হবে।
হিজরি ৪৯ সনে হযরত ইমাম হাসান (রা.) বিষপানে শহীদ হলে দুশ্চরিত্র এজিদ খলিফার পদে অধিষ্ঠিত হন। ষড়যন্ত্রকারী রাজ্যলোলুপ ও দুষ্ট চরিত্রের এজিদকে ইমাম হোসেন খলিফা বলে মানতে পারলেন না। তিনি এজিদের বির”দ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে দৃঢ়সংকল্প হলেন। এজিদের বির”দ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে কুফাবাসীর প্রতিশ্র”তি মতো হোসেন কুফায় যাত্রা করেন। কুফাবাসী প্রতিশ্র”তি ভঙ্গ করে এজিদের পক্ষ অবলম্বন করলে এজিদের বশ্যতা স্বীকার করার জন্য সেনাপতি প্রস্ড়াব দিলে ধর্মবীর হোসেন সে প্রস্ড়াব প্রত্যাখান করেন। ফোরাত নদীর তীরবর্তী স্থানে হোসেন তাঁবু ফেলেন। এই নদীর তীরেই এজিদ সেনাপতি সৈন্য সমাবেশ করে হোসেন (রা.) এর পানি সংগ্রহের সব পথ বন্ধ করে দিলো। বালক-বালিকা, শিশু-রমণী সকলেই পানি পিপাসায় আর্তনাদ করে ওঠলো। তাঁরা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আকুতি-মিনতি করেও একবিন্দু পানি পেলো না। পানির অভাবে তৃষ্ণায় ছোট শিশুরা প্রাণ বিসর্জন দিলো। পিপাসার যন্ত্রণায় অনুচর ও হোসেন পরিবারের লোকজন প্রাণ বিসর্জন দিলো। পাপিষ্ঠ এজিদের নিকট আত্মসমর্পণ করা হোসেনের পক্ষে সম্ভব হলো না। তিনি মনে করলেন– অধর্মাচারীর নিকট আত্মসমর্পণ করার চাইতে ধর্মযুদ্ধে আত্মদান করাই শ্রেয়। হযরত হোসেন বীরবিক্রমে শত্র”র দিকে অগ্রসর হলেন। শত্র”র নির্মম আঘাতে তাঁর অনুচর আত্মীয়-স্বজন বীরদর্পে যুদ্ধে করে প্রাণ দিলেন।

এজিদের আজ্ঞায় ফোরাত নদীকূল রক্ষিত করা হয়েছে। যাতে একবিন্দু পানি কেউ না নিতে পারে। হোসেন শিবিরে পানি তৃষ্ণায় হাহাকার গড়ে গেলো। সকলেই পিপাসায় কাতর হয়ে পানি! পানি!! পানি!!! বলে চিৎকার করে ছটফট করতে লাগলো। জল বিনে ছোট শিশুরা মারা গেলো। এক কাতরা পানির জন্য আসগর শত্র”র তীরবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারালেন। এজিদ সৈন্য ফোরাতকূল ঘিরে পাহারায় রত। এ সময় এজিদ বাহিনী অগ্রসর হতে থাকলো। চারদিকে হায়! হায়! রবে আকাশ-বাতাস ভারী হলো। শত্র”র আঘাতে হোসেনের সৈন্যগণ শহীদ হলেন। উপায় না দেখে হোসেন সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হলে এজিদ বাহিনী চারদিক হতে তাকে ঘিরে ফেললো। প্রাণপণে যুদ্ধ করতে করতে একসময় হোসেন মাটিয়ে লুটিয়ে পড়লেন। রক্তাক্ত হোসেনের বক্ষের উপর এজিদের লালিত সৈন্য সীমার চেপে বসলো। সে বারবার দেহ থেকে মস্ড়ক দ্বিখ-িত করার চেষ্টা করলো। রসূল (সা.) এর পবিত্র ওষ্ঠের চুম্বনে যে স্কন্ধদেশ পণ্ঢাবিত হতো, সে স্কন্ধদেশে নির্দয় পাষ” সীমার খঞ্জর চালালো। হোসেনের দেহ হতে মস্ড়ক দ্বিখ-িত করলো। চারিদিকে হায় হোসেন! হায় হোসেন! রবে ফোরাতকূল ভারী হলো। সম্মুখযুদ্ধে তিনি বীরের মতো জীবন উৎসর্গ করে শহীদ হলেন। ১১ মহররম হোসেন পরিবারকে বন্দী অবস্থায় কুফায় আনীত হয়। মহরমের ১২ তারিখ কারবালায় শহীদগণের লাশ দাফন করা হয়।

কারবালা প্রান্ড়রে ধর্মপ্রাণ মহাবীর হোসেনের আত্মাদানের ঘটনাটি বড়ই শোকাবহ। ধর্মপ্রাণ মুসলমান তাই প্রতিবছর মহররমের ১০ তারিখে সেই মর্মান্ড়িক ঘটনাকে স্মরণ করে অশ্র”সিক্ত হয়। এই কর”ণ ঘটনাকে স্মরণ করে আজও ধর্মপ্রাণ মুসলমানগন হোসেনের প্রতি ভক্তি সমারোহে, কারবালার প্রান্ড়রে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া-দর”দ পাঠ করেন। তাজিয়া সাজিয়ে শোভাযাত্রা করেন। শোভাযাত্রায় হায় হোসেন! হায় হোসেন কর”ণ ধ্বনি আজও ধর্মপ্রাণ মুসলিম হৃদয়কে স্পর্শ করে। অশ্র” বিসর্জনপূর্বক দোয়া দর”দ পাঠ করে ধর্মবীর হোসেন ও পূণ্যাত্মা শহীদানের প্রতি সম্মান দেখানোর রীতি আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। এর ধারাবাহিকতা পৃথিবী ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ড় অব্যাহত থাকবে। সাম্য ও মানবতার কবি কাজী নজর”লের কথায়-

কত মহরম এলো, গেলো চলে বহুকাল
ভুলিনি গো আজও সেই শহীদের লোহু লাল।
মুসলিম! তোরা আজ জয়নাল আবেদীন
ওয়া হোসেনা, ওয়া হোসেনা কেঁদে তাই যাবে দিন।
ফিরে এলো আজ সেই মোহররম মাহিনা,

ত্যাগ চাই, মর্সিয়া-ক্রন্দন চাহি না।।।

বসন্ড় বিলাপ

বসন্ড় জাগ্রত দ্বারে। আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা। এসো হে বসন্ড়। এসো হে বৈশাখ। পত্রপলণ্ডবে হিমেল বাতাস, ঝরা পাতার ডালে মুকুলিত শাখায় গুঞ্জন। শিমুল পলাশের লালিমায় রাঙা হয়ে বসন্ড়, নবীন জীবনে নিয়ে আসে উদ্দীপনা। প্রকৃতির উদাস, উদার হাওয়ায় হিলেণ্ডালে ভেসে আসে নতুন জীবনের সূচনা। বসন্ড়ের বিদায় নববর্ষের আগমন। বর্ষপরিক্রমায় দিন যায়, মাস গত হয়। বর্ষ চলে যায় পৃথিবীর নিয়মেই। দুঃখ-বেদনা পাওয়া-না পাওয়ার হিসাব না মিলতেই কালেন্ডারের বুকে সূচনা হয় নতুন দিনের একটি বছরের। নতুনের আহ্বানে সাড়া দিতে জেগে ওঠে নবীন মন। উৎসবমুখর পরিবেশে অনিশ্চিতের সুনিশ্চিত সম্ভাবনার আহ্বান জাগে সবার মনে। বিগত দিনের স্মৃতিময় অতীত দূরে ঝেড়ে-মুছে জন্ম নেয় আরেকটি নতুন বছরের।

নববর্ষ। পহেলা বৈশাখ। মহাকালের স্রোতধারার অতীত দিনের স্মৃতি রোমন্থন লুপ্ত রেখে নতুন কল্পনায় হাসি-আনন্দে মনকে ভাসাতে চায় সবাই। বসন্ড়ে যে ফুল ফোটে, যে পাখি গায়, নববর্ষে তা পরিপূর্ণতা পায়, মনে মনে জনে জনে পাওয়া না পাওয়ার অব্যক্ত সুর। উদাস পাখি ডেকে যায় 'বৌ কথা কও'। বেদনাহত পাখির কর্ণ কণ্ঠে বেদনা জাগে। কি বেদনা তার? তবুও বসন্ড় আসে, বনে বনে ফুল ফোটে, পাখি গায়। সম্মুখের অনিশ্চিত কোনো সম্ভাবনাকে আশাহত করে তোলে। তবুও বেঁচে আছি, থাকবো। বসন্ড় বাহারে আন্দোলিত হয়ে নয়, বসন্ড় বিলাপে মন আচ্ছন্ন করে।

আজ পহেলা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ। প্রতিবারের মতো এবারও নববর্ষ

কোলাহলময় পরিবেশে আগত। কিন্তু ভিন্নতা শূন্যতা ও অপ্রাপ্তির মাঝে দাঁড়িয়ে আছি। বৌমা, গত নববর্ষেও তুমি ছিলে। এখন তুমি নেই। মাহীন, রবি,

তাদের আদরের ছোট মামীকে সবার আগে নববর্ষ জানাবে না। বড় বৌ মীনা, সেজো বৌ বন্যা তোমার শুভেচ্ছা পাবে না। আঁখি, সাথী, বীথিকে তুমি ফোন করে শুভ কামনা জানাবে না। নববর্ষের কাকডাকা ভোরে আর কখনো বলবে না "মা, শুভ নববর্ষ"। তুমি এসবের অনেক উর্ধ্বে চলে গেছো। কিন্তু তুমি আছো আমাদের অন্তর জুড়ে।

প্রতি নববর্ষে নানা সাজে সজ্জিত হয় বিপুলা ঢাকা নগরী। ফুলে ফুলে বর্ণিল রঙে ঢঙে ছাওয়া ঢাকা ভার্সিটির রমনা বটমূলের জৌলুসপূর্ণ বর্ষবরণ উপেক্ষা করে তুমি চলে আসতে আমাদের মাঝে। বর্ষবরণ উপলক্ষে তোমাদের তিন বৌ ও শিউলিকে আমি কিছু উপঢৌকন দিতে চেষ্টা করতাম। শেষবার ৪ খানা শাড়ি কিনলাম ভিন্ন ভিন্ন রঙের। বড় বৌ সেজো বৌকে শাড়ি পছন্দ করে নিতে বললাম। ওরা বললো- মা, ফেরদৌসি আসুক ও পছন্দ মতো নিলে আমরা পরে নিবো। এতো ভালোবাসতো ওরা তোমাকে। সামান্য উপহারে তুমি খুশি হতে। সিঙ্গাপুর যাবে চিকিৎসার জন্য। তখন তুমি ল্যাবএইড হাসপাতালের কেবিনে গুরুতর অসুস্থ। আমার দেয়া শাড়িখানা বারবার গায়ে জড়িয়ে তোমার মা ও বোনকে দেখালে। শাড়ির কারুকাজটা খুব সুন্দর হয়েছে বলে প্রশংসা করলে। তোমার হাঁটার সামর্থ্য ছিলো না। রোগাতুর শরীর তোমার, কিন্তু সেদিনও শাড়িখানা গায়ে জড়িয়ে বসন্তের ছোঁয়া লেগেছিলো তোমার মনে। আজ এসব থেকে তুমি যোজন যোজন দূরে। হারুণ নাজের বিয়েতে তুমি অনেক আনন্দ করতে চেয়েছিলে । ওদের ঘিরে তোমার অনেক স্বপ্ন ছিলো। বিয়েতে কোন শাড়ি পরবে, তাও বাছাই করে রেখে গেলে। বিয়ের গায়েহলুদ অনুষ্ঠান, জন্মদিন, বিবাহ বার্ষিকী পালন এবং উদযাপন তুমি খুব উপভোগ করতে। তোমার ডায়েরিতে সব তথ্য লেখা থাকতো। তুমি এখন এসবের অনেক উর্ধ্বে। পৃথিবীর আনন্দযজ্ঞে তুমি নেই। সকল মায়া ছিন্ন করে তুমি ওপার জগতে চলে গেছো। দোয়া করি, তোমার কবর-জগত, হাশর দিন; পুলসিরাত সর্বোপরি আখিরাত যেনো পৃথিবীর সকল মোমিন নারীদের সাথে হয়। পরকালের সকল সিঁড়ি অতিক্রম করে মহান আল্লাহ যেন তোমাকে জান্নাতবাসী করেন।

বৌমা, বুকের ভিতর নতুন একটা চাপা কষ্ট। যা কারও সাথে শেয়ার করতে পারি না। তোমাকে হারানোর তীক্ষ্ণ বেদনার ক্ষত, সারা জীবন আমাকে বয়ে বেড়াতে হবে। এ কষ্ট বুকে নিয়েই চলছি। চাওয়া আর পাওয়ার নিরানন্দ

বেদনার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছি। মৃত্যুর অমোঘ আহ্বানে সাড়া দিতে হবে সবাইকে আগে বা পরে। শেষ বিদায়ের সময়ই মানুষ বুঝতে পারে সত্যিকারের ভালোবাসা। মোহাম্মদপুর বাসায় তোমার কফিন সারাক্ষণ আগলে রেখেছে হারুণ। সবাই বলাবলি করছিলো- ছেলেটা কফিন থেকে একমুহূর্তও সরছে না। এতোটুকু ভালোবাসা তুমি অর্জন করেছিলে। তুমি হারিয়ে গেছো আমাদের নিকট থেকে; কিন্তু নিয়ে গেছো অজস্র দোয়া ও ভালোবাসা। প্রিয়জনের মৃত্যু মানেই কোলাহলময় পৃথিবীর নানা অনুষঙ্গে যত কথা যত স্মৃতি রোমন্থন করা। আমার পরিবারের ছোট বড় সকলের নিকট থেকে পাওয়া ভালোবাসা তোমার নিকট গচ্ছিত রইলো। আর আমরা যা পেয়েছি, তা আজীবন সযতনে বক্ষে ধারণ করে রাখবো। তোমার নিকট থেকে পাওয়া শ্রদ্ধাঞ্জলির সুখস্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকবো। যতদিন বেঁচে আছি, আমি আকাশের গায়ে লিখে রাখবো, ভালো আছি, ভালো থেকো।

-তোমার শাশুড়ি।

শ্বশুরবাড়ি

জীবনের এক বিশেষ অধ্যায় অবসরজীবন। দীর্ঘ পয়ত্রিশ বৎসর কর্মজীবন শেষে অবসর যাপন করছি। রুটিন বাঁধা কর্ম ব্যস্ততার চঞ্চলতা নেই। আছে সংসারের কোলাহল। সেখানে পরিদর্শকের ভূমিকা পালন করছি। পুত্র পুত্রবধূ নাতি-নাতনি পাশের বাড়িতেই মেয়ে জামাতা, ভাসুরের ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা। এ যেন আমারই রাজ্য। সবাই মিলে বেশ আছি। ১৯৬৬ সালের ৩১ শে জুলাই ঘর বাঁধলাম ময়থা গাছপাড়া নিবাসী (বাসাইল থানার অন্তর্গত) ছাদের আলী মিয়ার সাথে। আমার শ্বশুর ও মেজো ভাসুরের পছন্দমতো সবাই একমত হয়ে বিয়ের কার্য সমাপন হলো। বিয়েতে আমার চাচাশ্বশুর হাতেম আলী মিয়া, বড় ভাসুর আব্দুল গণি মিয়া, খালেক মিয়া, খালাতো দেবর ময়েন ভাই ও চাচাতো দেবর মতিন ভাইসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। বিয়েতে জাঁকজমকপূর্ণ কোনো আয়োজন ছিলো না। ভাবীরা গায়ে হলুদ মেখে আমাদের গোসল করালেন, বর-কনেকে একই মজলিসে উপস্থিত করা হলো। কা জী সাহেবের উপস্থিতিতে চাচাশ্বশুর আলহাজ হাতেম আলী মিয়া বিয়ে পড়ানোর কাজ সম্পন্ন করলেন। আমার শ্বশুর একজন বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। আমাদের পরিবারটি উনার নিকট ভালো লেগেছিলো। বিশেষ করে আমার বাবাকে তিনি একজন পছন্দের মানুষ হিসাবে পেয়েছিলেন।

এখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই আমার শ্বশুরের পূর্বপুরুষের পরিচয় তুলে ধরছি। যতদূর জানা যায়, আমার শ্বশুরের পূর্বপুরুষেরা আরব দেশ থেকে কুমিল্লা এসে বসবাস শুরু করেন। সেখান থেকে এই বংশের একজন কালিহাতী থানার বলধি গ্রামে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলেন। তাঁদের পূর্বপুরুষের একজনের নাম

ইনাম উদ্দীন। তার ছেলে সুনাম উদ্দীন। সুনামুদ্দিনের এক ছেলে কামাল উদ্দীন। কামাল উদ্দীন মারা গেলে তার ছেলে জামাল শিকদার লা শরীক হয়ে মায়ের সাথে নানাবাড়ি ময়থা গাছপাড়া চলে আসেন। এই জামাল শিকদারের ৩ ছেলে। যথাক্রমে বারু শিকদার, জোনাব আলী শিকদার ও বন্দে আলী শিকদার। বারু শিকদারের ৫ ছেলে; তারা হলেন ওয়াহেদ বখশ, করম বখ্শ, মাজম সরকার, মৌ. আলহাজ হাতেম আলী ও আব্দুল হামিদ মিয়া। জোনাব আলীর ৬ ছেলে, রোস্তম শিকদার ইয়াকুব আলী, আকরাম হোসেন, আজু মিয়া, ইছা মিয়া, মুক্তা মিয়া। বন্দে আলী শিকদারের ৩ ছেলে ও ১ মেয়ে। তারা হলেন মো. আব্দুর রহমান, আব্দুস সামাদ, আব্দুল বাকী ও নজিরন নেছা। উল্লেখ্য, আব্দুল বাকী ব্যতীত আর সবাই ছোটবেলায় মারা যান। আব্দুল বাকী মুনশীর ৪ ছেলে ২ মেয়ে। বড় মেয়ের নাম জয়গুননেছা, ছেলেরা হলেন আব্দুল গণি মিয়া, আব্দুল খালেক মিয়া, ছাদের আলী মিয়া, রেজিয়া খাতুন ও লেবু মিয়া। রিজিয়া ও লেবু মিয়া ছোটবেলাতেই মারা যায়। আমার শাশুড়ির নিকট আমার শ্বশুরের পূর্বপুরুষের অনেক গল্প শুনেছি।

আমার শ্বশুর মুনসী আব্দুল বাকী মিয়া একজন বলিষ্ঠ দেহ অবয়বের সুপুরুষ ছিলেন। দীর্ঘ দেহী, প্রশস্ত বুকের ছাতি, হাতের আঙ্গুলগুলো মর্তমান কলার মতো ছিলো। দেড়/দুই বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়া মায়ের স্নেহ-যত্ন লাভ করেই বড় হন। পিতার অবর্তমানে যথেষ্ট সংগ্রাম করে তিনি বড় হন। তার অন্য কোনো ভাই-বোন না থাকলেও পাতানো বোন ও বন্ধুর অভাব ছিলো না। তিনি বন্ধু বৎসল ছিলেন। তার বন্ধুরা সংসার জীবনে তাকে অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। শাশুড়ির নিকট জেনেছি, আমার দাদী শাশুড়ি অনেক সংযমী ও ধৈর্যশীল মহিলা ছিলেন। একমাত্র পুত্রকে অবলম্বন করে দীর্ঘ জীবন পাড়ি দিয়েছেন। তিনি প্রায় ৮৫ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

প্রায় ৫০ বৎসর আগের কথা। দুইজন ছাত্র-ছাত্রী সংসারের পথে পা বাড়ালাম। আমার যখন বিয়ে হয়, তখন আমি ময়মনসিংহ মহিলা কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্রী। ছাদের সাহেব তখন টিচার্স ট্রেনিং কলেজে বিএড পড়ছেন। পরের বৎসর এমএড কোর্স সমাপ্ত করে ফুলবাড়িয়া হালুয়াঘাট, বাট্টাভাট পাড়া হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। কোনো এক সুযোগে তিনি নেত্রকোণা সরকারি আঞ্জুমান হাইস্কুলে সহশিক্ষক পদে নিয়োগ পান। তখন আমাদের প্রথম সন্তান শিউলীর বয়স দুই বৎসর। ছাদের আলী সাহেব দীর্ঘদিন বিন্দুবাসিনী সরকারি হাইস্কুলে সহশিক্ষক ও ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসাবে

দায়িত্ব পালন করেন। তারপর টাঙ্গাইল জেলার জেলা শিক্ষা অফিসার হিসাবে ২০০২ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

আমার শ্বশুর সার্থক একজন সংসারী মানুষ ছিলেন। তিনি জীবনে কখনও অভাব বোধ করেননি। হালের গরু, পালের দুধ, বিলের মাছ, ফসলের ক্ষেত ছিলো তার বিশেষ সম্পদ। জমজমাট সংসার আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত মন্ডলে তিনি সুন্দর জীবন অতিবাহিত করেন।

সেই ১৯৬৬ সনের কথা। আমার বাবার বাড়ি ঘাটাইল থানার অন্তর্গত দত্তগ্রাম। তখন যাতায়াত এতো সহজ ছিলো না। আমার শ্বশুর ময়থাপাছপাড়া (বাসাইল থানার অন্তর্গত)। এখান থেকে পায়ে হেঁটেই আমাদের বাড়ি যেতেন। যাত্রাপথে দুই-এক স্থানে আত্মীয়দের সাথেও দেখা করতেন। আমি বর্ষা মাসে নৌকায়, গ্রীষ্মকালে ডুলিতে শ্বশুরবাড়ি যাতায়াত করতাম। তখন কিছু কিছু ডুলি ও পালকির প্রচলন ছিলো। কোনো কোনো সময় বাসে করটিয়া পর্যন্ত গিয়ে পায়ে হেঁটে, না হয় ঘোড়ার গাড়ি টমটম। ময়থা গাছপাড়ায় তখন ফাইলামালির একটি ঘোড়ার গাড়ি ছিলো। ওর গাড়িতে করেই আমরা যাতায়াত করতাম। আমার সাহেব সারারাস্তা ফাইলার সাথে শৈশবের কথা গল্প করতো। একসময় বাড়ি পৌঁছে যেতাম। বর্ষাকালে আমার শ্বশুর আমাকে আনতে দত্তগ্রাম যেতেন। সাথে থাকতো ভাতিজা সালাম, রুহুল, নুরুল। বর্ষায় ভ্রমণটা আনন্দ দায়ক হতো। চারদিকে থৈ থৈ পানি, শাপলা, শালুক, উড়ন্ত বকের ঝাঁক, পাল তোলা নৌকা। এখন বর্ষা নেই, সে পাল তোলা নৌকাও নেই। সে দৃশ্য স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে। এখন রিকসা অটো সিএনজি হরদম দেদার মিলে। ভ্রমণে এতো সময়ও লাগে না। কোনো অসুবিধা নেই। তবে আগের মতো বাবার বাড়ি ও শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার সুযোগ মিলে না।

ছাত্র অবস্থায় আমার বিয়ে হয়। তাই আনুষ্ঠানিক ছুটি ছাড়া আমার শ্বশুর বাড়ি যাওয়া হতো না। দু'জন ছুটি পেলেই চলে যেতাম। যে কয়দিন থেকেছি আনন্দঘন পরিবেশে কেটেছে। ভাতিজা তোতা জুয়েল সালাম রুহুল নুরুল কালাম ভাতিজি লুসি, ফিরোজা, সবসময় আমাকে সঙ্গ দিতো। আমি যখন রান্না করতাম, তরকারি কাটতাম; ওরা আমাকে ঘিরে বসে থাকতো। ওদের সাথে গল্প বলতে বলতেই আমার কাজ শেষ হতো। জ্যোৎস্নারাতে উঠানে পিঁড়ি পেতে বসে গল্প চলতো। ফরহাদ আনিস রসিকতা করতো। এখনও বাড়ি গেলে সবার আন্তরিক সাহচর্য পাই।

আমার শ্বশুরের সংসার বড় ছিলো। কাজের চাপও ছিলো বেশী। আমার জায়েরা

ভরদুপুর রাতে ঢেঁকিতে ধান বানতেন। কোনোদিন সারারাত ভরে ধান সিদ্ধ করতেন। মেজো ভাসুর ভোর রাতে মলন জুড়তেন। উনার কলরবে ঘুম ভেঙ্গে যেতো। এখন বৌদের কষ্ট কমে গেছে। ধান ভাঙার মেশিন বাড়ি এসে ধান ভাঙ্গিয়ে দিয়ে যায়। মেশিনে ধান মাড়াই করা হয়। আমার শ্বশুরের অনেকগুলো গরু ছিলো। তার মধ্য সুন্দর বলদ ও দুধাল গাভী ছিলো। কোনো সময় ৩টা কোনো সময় ২টা দুধাল গাভী থাকতো। আমার শাশুড়ি দুধ দোহন করে যখন হাঁড়ি ভর্তি করে আনতেন, সে দুধের কী মিষ্টি ঘ্রাণ! রঙও বেশ চমৎকার। এখনও সেই দুধের ঘ্রাণ অনুভব করি। শাশুড়ির হাতের দুধের পিঠা, দুধপুলি, ক্ষীর, ঝালপিঠা খুব মজাদার হতো। পিঠা বানানোর আয়োজন চলতো প্রায় মধ্যরাত পর্যন্ত। মজা হতো আমার মেজো জাকে নিয়ে। দুধপুলি পিঠা বানাতে গিয়ে পিঠা হাতে নিয়েই ঘুমিয়ে যেতেন।

ময়থা বিল, গজারি বিল, কৈজুরি বিলের মাঝখানে ময়থা গ্রামটি। বর্ষাকালে আগে প্রচুর পানি হতো। মনে হতো গ্রামগুলো যেন পানিতে ভাসছে। দূরগাঁয়ের লণ্ঠনের আলো জোনাকির আলোর মতো মনে হতো। বর্ষাকালে করটিয়া হাট, বাথুলি ও রামপুর হাটে নৌকাযোগে যাওয়া হতো। সন্ধ্যার পর দূরের নৌকার হারিকেনের আলো পানিতে পড়ে জ্বলজ্বল করতো। সে দৃশ্য বড়ই মনোরম। বিলের শাপলা শালুক ও মাছ ধরা ভাতিজাদের প্রাত্যহিক কাজের অনুষঙ্গ ছিলো। বিশেষ করে ভাতিজা কালাম মাছ ধরায় পারদর্শী ছিলো। ওর চাচারাও মাছ ধরতো প্রচুর। শাশুড়ির কাছে গল্প শুনেছি, আমার সাহেব ও মেজো ভাসুর নৌকা বোঝাই করে প্রচুর মাছ ধরে ছিলেন। এতো মাছ সংরক্ষণের কোনো সুযোগ ছিলো না। নানা পদের তরকারি করা হলো। শুটকি দেয়া হলো। শেষে কুটতে না পেরে আমার শাশুড়ি রাগ করে ধামা ভরা মাছ ছাইকুড়িতে ফেলে দিলেন। এসব কথা এখন রূপকথার গল্পের মতোই মনে হয়। আমার শাশুড়ি আমার বাবার বাড়িও প্রচুর মাছ রান্না করে পাঠাতেন। সেই বিলঝিল এখনও আছে। ঋতু পরিবর্তনের কারণে বর্ষায় পানি হয় না। তাই বিলে মাছও নেই। আমার শাশুড়ির অনেকগুলো মাটির সালুনের পাতিল ছিলো। কোনো কোনো দিন ৫/৬ পদের মাছের সালুন রান্না হতো। তৈজসপত্রগুলো সারি সারি করে সাজানো থাকতো। আমার শাশুড়ি পিঁড়িতে বসে নিপুনহাতে পরিবেশন করতেন। মাটিতে পাটি বিছিয়ে আগে ছোটরা তারপর কর্মচারী, বাড়ির বয়স্করা সবার শেষে আমরা বৌয়েরা খেতে বসতাম। একসাথে খাওয়ার মধ্যে আনন্দই অন্যরকম। আমার শাশুড়ি নিপুণ হাতে খাওয়ার সব আইটেম বিতরণ করতেন। প্রথম বৈঠক হতে শেষ বৈঠক পর্যন্ত। কারও কোনো অনুযোগ থাকতো না।

নিয়মিত পান খেতেন না আমার শাশুড়ি। তবে উনার সুন্দর একটি মাটির পান সুপারির ডিব্বা ছিলো। খাওয়ার পর আমাকে ছোট্ট করে একটু পান বানিয়ে হাতে ধরিয়ে দিতেন। পরবর্তীতে এভাবেই পান খেতে অভ্যস্ড় হয়ে পড়ি।

বর্ষাকালে আমার শাশুড়ি, বৌমা, নাতি-নাতনিদের নিয়ে ছেউটি থলপাড়া বাপের বাড়ি বেড়াতে যেতেন। আমার শ্বশুর সখ করে একটি পানসি নৌকা কিনেছিলেন। আমার বিয়ের পর কয়েকবার ওখানে বেড়াতে গিয়েছি পরিবারের সবাই মিলে। যাওয়ার দিন ভোর রাতেই শাশুড়ি ভাত তরকারি ডাল, রান্না করতেন রাস্ড়ায় খাওয়ার জন্য। আমরা সকাল সকাল রওনা দিতাম। দুপুরবেলা সবাই মিলে নৌকায় বসে খাওয়া খুব মজার ব্যাপার। ছোট মাছ দিয়ে লতার তরকারি মুসুরের ডাল যেন অমৃত। নৌকায় বসে আখ খাওয়া। ভাসমান নৌকার দোকান থেকে জিলাপি গজা গরম গরম খুব স্বাদের। শেষবার পরিবারের সবাইকে নিয়ে নৌকাযোগে ছেউটি যাওয়া হলো। ভাতিজা, ভাতিজি জামাই ইব্রাহীম, হেনা, শিউলী, সুহেল, সুমন সবাই মিলে খুব আনন্দ হয়েছিলো। শ্রাবণের ভরা মৌসুম। আমাদের নৌকা পাল তুলে দাঁড় টেনে চলছে। হঠাৎ ইব্রাহীম সুহেল সুমন মাঝ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ওরা সাঁতার কেটে স্রোতের বিপরীত দিকে নৌকার সাথে চলছে। বর্ষাকালে নদীতীরের সৌন্দর্য খুবই মনোরম। তীরে তীরে কাশের বন, আখের খেত, গাঙচিল ও মাছরাঙা পাখি মাছ ধরার কৌশল দেখতে দেখতে আমাদের নৌকা এগিয়ে চললো। সন্ধ্যা পর্যন্ড় আমরা পৌঁছে গেলাম। মামা-মামিশাশুড়িরা আমাদের দেখে যেন আকাশের চাঁদ পেলেন। কোথায় বসাবেন, কি খাওয়াবেন এ নিয়ে হৈচৈ পড়ে গেলো। নাস্ড়া খাওয়া, তারপর রান্নার আয়োজন। হরেক রকম মাছের তরকারি, পিঠা পায়েস ইত্যাদি। তখনকার দিনে প্রচুর মাছ পাওয়া যেতো। মাছের বিরন ভুনা ঐ বাড়ির একটি ঐতিহ্য ছিলো। পরদিন সকালবেলা চালের রুটি, হাঁসের মাংস। বড় মামী, ছোট মামী পালণ্ঢা দিয়ে আদর-যত্ন করতেন। মামাতো ননদ কাবিলন, চাম্পা রাবেয়া সবার নিকট অনেক আদর যত্ন পেয়েছি।

২/৩ দিন থাকার পর বিদায়বেলায় বড়মামি ছোটমামির কী দরদমাখা অভিব্যক্তি! তাদের চোখের জলে বিদায়। যতদূর পর্যন্ড় দেখা যায়; সবাই

দাঁড়িয়ে আছে। সে দৃশ্য বড়ই বেদনাদায়ক। জীবনে অনেক আত্মীয়বাড়ি গিয়েছি। আমার মামাশ্বশুরবাড়ির আতিথেয়তার কথা ভুলবো না। মামা-মামীরা

কেউ বেঁচে নেই। আলণ্ঢাহ তাদের বেহেশত নসিব করুন। এখন কালে-ভদ্রে ছেউটি যাওয়া হয়। মামাতো দেবর তাদের বৌ-ঝিরাও যথেষ্ট আদর-যত্ন করে।

১৯৭৩ সনে শিক্ষক স্বামী বদলি হলেন নেত্রকোণা থেকে টাঙ্গাইল শহরে। ভাড়া বাসায় থাকি। শ্বশুর সাহেব আমাদের সাথে থাকতেই পছন্দ করেন। মাঝে-মধ্যে বাড়ি যান। বাড়ি থেকে আসার সময় গাছের কামরাঙা, লাউ শিম একবোঝা করে নিয়ে আসতেন। ময়থা বিলের মাছ ঝাঁকা ভর্তি করে আনতেন। শিং, মাগুর, কৈ, শোল, বোয়াল নানা জাতের মাছ। সেসব মাছ এখন আর নেই। শ্বশুর সাহেবের বড় একটা গুণ ছিলো আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশীদের খোঁজ-খবর নেয়া। টাঙ্গাইলে আত্মীয়স্বজন ও আমাদের পরিচিতজনদের নিকট তিনি একজন 'ভালো মানুষ' হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আমার আত্মীয় পাশের বাসার ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল হামিদ সাহেব বদলি হলেন। লাকী আরিফ দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আপার একা বাসায় থাকা সম্ভব নয়। তাই তিনি দায়িত্ব সহকারে ওদের বাড়ি রাত কাটিয়েছেন। নিজের দায়িত্ববোধ থেকেই তিনি গুরুত্বসহ এ দায়িত্ব পালন করেছেন। হামিদ সাহেবের একমাত্র মেয়েকে তিনি লাকি বুজি ডাকতেন, তাকে অনেক স্নেহ করতেন।

শ্বশুর সাহেবের বড় একটা গুণ ছিল বই পড়া। বই পড়ে তার মর্মার্থ আমাকে শোনাতেন। তিনি গল্পরসিক ছিলেন। তার গল্প বলার দক্ষতা ছিলো সুনিপুণ। কোনো ডিগ্রিধারী পাস করা না থাকলেও উচ্চতর ক্লাসের সব বই পড়তেন।

তিনি নিয়মিত পাক কোরআন পাঠ করতেন। প্রতি রোজায় ৩/৪ বার কোরআন খতম দিতেন। গল্পের বই পড়ায় উনার ঝোঁক ছিল অনেক। শরৎচন্দ্রের পল-ী সমাজ, চাঁপাডাঙার বউ, মেজ দিদি, দেনাপাওনা, রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি, সোনার তরী, শেষের কবিতা, বিমল মিত্রের কড়ি দিয়ে কিনলাম ও পড়তেন। রাতের বেলা গল্প করতে উঠানে বসতেন। বাড়ির ও পাড়ার লোক জড়ো হতো গল্প শোনার জন্য। এই সুযোগে গৃহস্থালি কাজের জন্য রশি পাকানো শেষ হতো। উনার চা হুক্কা খাওয়ার অভ্যাস ছিলো। কলকিতে তামাক সাজিয়ে আগুনের জন্য অপেক্ষা করতেন। আমি কলকিতে আগুন ভরে দিতাম। এতে খুব খুশি হতেন।

আমার শ্বশুর সাহেব পাড়ার লোকদের নিকট 'মুনসি সাব' বলে পরিচিত ছিলেন। পাড়াপ্রতিবেশীদের নিকট তিনি একজন আদর্শ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন। সে সময় গ্রামে বেশ কয়েক ঘর হিন্দু সম্প্রদায় বাস করতো। নেদামালি, নারু

মালি, ফাইলা মালি- এরা শ্বশুরের নিকট বুদ্ধি নিতে আসতো। সৎকাজ ও সৎ পরামর্শ দিতেন সবাইকে। আমি আমার শ্বশুরের প্রিয়পাত্র ছিলাম। শাশুড়ি ও জাদের সাথে একদিনের জন্য আমার কোনো প্রকার তিক্ততা বা মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়নি। আজও সবার সাথে আমার মধুর সম্পর্ক রয়েছে। ভাতিজা-ভাতিজি সবাই আমাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। এখানেই আমার বড় সার্থকতা, বড় পাওয়া। জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ড় পরিবারের সবার সাথে যেন সুসম্পর্ক থাকে, সে আশাই করি।

আমাদের প্রতি শ্বশুর-শাশুড়ির বড় কোনো আবদার ছিলো না। উনারা অল্পেই তুষ্ট ছিলেন। তাদের আবদারগুলো মিটাতে আমি চেষ্টা করতাম। টাঙ্গাইল বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে আমার চাকরি হলো। শ্বশুর সাহেব খুব খুশি হলেন। বেতন পেয়ে উনার হাতে দিতাম। খুব খুশি হতেন। টাকা হাতে পেয়ে চুমো খেতেন, দোয়া করতেন। আমাকেই আবার ফেরত দিতেন। শাশুড়ির ছোটখাটো বায়নাগুলো আমার কাছে করতেন। মিটাতে চেষ্টা করতাম। এতো অল্পে তুষ্টের মানুষ আর নেই।

১৯৭৮ সালে রমজান মাসে শ্বশুর সাহেব গ্রামের বাড়ি গেলেন। সবার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। ঈদুল ফিতরের নামাযের মাঠে সবার সাথে কুশল বিনিময় করে ক্ষমা চাইলেন। শেষবার টাঙ্গাইল আসলেন। তার বলিষ্ঠ সুঠাম দেহ কিঞ্চিৎ দুর্বল হলো। ডাক্তার চিকিৎসা দিচ্ছেন। মরণ হাতছানি দিলো। মৃত্যুর পূর্বে আমাকে একটি লেডিস ঘড়ি কিনে দিলেন। ঘড়িটি হাতে পরে উনাকে দেখালাম। তিনি খুশি হলেন। আমাকে বুকে জড়িয়ে আদর করলেন।

জীবনের শেষ প্রান্ড়ে দাঁড়িয়ে প্রায় সময়ই তিনি বৃহস্পতি ও শুক্রবার মৃত্যু কামনা করতেন। টাঙ্গাইল জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে জানাযা প্রার্থনা করতেন। মৃত্যু কাউকে ভরসা দেয় না। সে দুবাহু বাড়িয়ে থাকে জীবন হরণের জন্য। জীবনের সীমানা পেরিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয়। এটাই বিশ্বস্রষ্টার অমোঘ নিয়ম। উনার বিরাট ঋজু দেহ ৬/৭ দিনের অসুস্থতায় ন্যুব্জ হয়ে পড়লো। চলার শক্তি হারালেন। কাছের-দূরের আত্মীয়স্বজন উনাকে শেষ দেখা দেখতে এলো।

আমরা আশা-নিরাশার দোলায় দোদুল্যমান। কখন যেন কী হয়। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১ ঘটিকায় তিনি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন। ইন্নালিলণ্ডাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। উনার ইচ্ছা অনুযায়ী শুক্রবার বাদ জুমা টাঙ্গাইল জামে মসজিদে জানাযা অনুষ্ঠিত হয় এবং বেবিস্ট্যান্ড গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। এর চার বৎসর পর আমার শাশুড়িও ইনতেকাল করেন। আলণ্ডাহ পৃথিবীর সকল জীবিত ও মৃত বাবা-মাকে বেহেশত নসিব কর‌ুন।

আমার পছন্দের ভালো লাগার ও ভালবাসার মানুষ বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি কেউ জীবিত নেই। আমি তাঁদের নিকট থেকে যে আন্ড়রিক দোয়া-আশির্বাদ পেয়েছি, যতদিন জীবিত থাকবো তা আমার মাথার মণি হয়ে থাকবে। তাদের আশির্বাদে আমার বাড়িতে পাকা দালান ওঠেছে। নাতি-নাতনিরা যোগ্যতা অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ তারা বেঁচে থাকলে খুব খুশি হতেন।

জামাই উপাখ্যান

সবার মনে সাড়া জাগানো আনন্দঘন মুহূর্তের কথা স্মৃতির মানসপটে আয়নার মতো জ্বলজ্বল করে। আমাদের পরিবারটি ভাসুর ননাসের ছেলেমেয়ে, মামাতো ননদ দেবর ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত একটি বড় পরিবার। আমার শ্বশুরবাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনে সাহায্য-সহযোগিতা ও আনন্দ বর্ধনে তারা সবাই তৃপ্তি দান করেছেন। তাদের অনেকেই বেঁচে নেই; কিন্তু তাদের স্মৃতি মাঝে মাঝে মনে দোলা দেয়। তাদের কর্মকান্ডকে ধরে রাখার জন্য এ লেখার আয়োজন। বিশেষ করে আমার ভাসুর ও ননাসের মেয়ের জামাতারা আমার নিকট অতি আদরের ও স্নেহের পাত্র। আমি তাদের নিকট অতি সম্মান ও শ্রদ্ধার চাচি শাশুড়ি ও মামি শাশুড়ি। সবার বড় জামাতা হলো–

১। ভাগ্নিজামাতা তৈয়ব আলি, পাইকড়া, কালিহাতী, বিশিষ্ট কাঠের ব্যবসায়ী।

২। ভাস্তিড় জামাতা রমেজ মোলণ্ঢা, নলুয়া, সখিপুর, প্রাথমিক শিক্ষক।

৩। ভাস্তিড় জামাতা মোহাম্মদ আবু সাঈদ, পুলিশ কনস্টেবল।

৪। ভাগ্নি জামাতা শামছু মিয়া, বড় ব্যবসায়ী, সোনালিয়া, করটিয়া।

৫। মোহাম্মদ ইব্রাহীম মিয়া, প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান, ফুলকি।

৬। মেয়ের জামাতা মোহাম্মদ আব্দুল মুত্তালিব, এজিএম, সোনালি ব্যাংক।

এরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব অবস্থানে থেকে আমাদের পরিবারটিকে আদর্শ ও সুখময় করে তুলেছে। আমার শ্বশুর ভ্রমণবিলাসী ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন। সেই সূত্র ধরে তার ছেলেরাও নানা অনুষ্ঠানের আয়োজনে জামাইদের খোঁজ করেন। জামাতারাও আমাদের আহ্বানে আন্তরিকতার সাথে সাড়া দেয়। ভাস্তিড় জামাই

আবু সাঈদ ও রমেজ মোলণ্ঢা অসুস্থ হয়ে মারা গেলো। ওদের মৃত্যু আমাদের নিকট বেদনাদায়ক। পরপর দুজনের মৃত্যুতে পরিবারটিকে শোকাহত করে তোলে। জামাতাদের মধ্য তৈয়ব আলী, শামছু মিয়া, আবু সাঈদ, ইব্রাহীম খুবই মন মজানো মানুষ। আবু সাঈদ অতিথিপরায়ণ ছিলো। ছেলে-মেয়ের বিয়েতে আমোদ-আহলাদ করবে, এই আশাটা আমার কাছে ব্যক্ত করেছিলো। আবু সাঈদ অকালে মৃত্যুবরণ করলো। ইব্রাহিম একজন সমাজসেবী-রাজনীতিবিদ। বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠানে ওরা না থাকলে যেন আনন্দটাই পূর্ণ হয় না। আমাদের যে কোনো অনুষ্ঠানে ওদের হাতের কাছে পাই। ওরা আন্তড়রিকভাবেই আমাদের ডাকে সাড়া দিতে আগ্রহী। ভাতিজা সালাম, রুহুল-নূরুলের, সোহেল সুমন, শিউলীর বিয়েতে ওরা খুব আনন্দ দিয়েছে। ওদের হৈ-হুল- া হাসি-তামাশা যে কোনো অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্তড় করে তোলে। সে সব আনন্দময় ঘটনা স্মৃতির পাতা থেকে ভাষায় প্রকাশ করার সুযোগ পেলাম।

ভাতিজা আব্দুস সালামের বিয়ের পরের দিন। ভাতিজা কালাম ও নূরুল ফকির দরবেশ সেজে সবাইকে আনন্দ দিলো। হক মওলা, হক মওলা ডাকের সাথে সাথে ছোট ছেলে-মেয়েরা ভিড় জমালো। পরের দিন সব জামাতা মিলে ফন্দি করলো নতুন বৌ রানুকে জব্দ করবে। ওদের ফিসফিসানি আমার দৃষ্টিগোচর হলো। ওরা বৌকে পরীক্ষা করবে বৌ সংসারী, লক্ষ্মী হবে কিনা। সবার অগোচরে আমি নতুন বৌকে সাবধান করে দিলাম- ওরা কিন্তু বাড়িময় মরিচ পিঁয়াজ ছড়িয়ে রেখেছে, তুমি ওগুলো খুঁটে আঁচলে জড়ো করবে। জামাতা তৈয়ব আলী নতুন বৌয়ের হাতে ঝাড়ু তুলে দিল। ইব্রাহীম, রমেজ মোলণ্ঢা তদারকি করতে থাকলো। বৌ ঝাড়ু দিচেছ আর একটা করে পিঁয়াজ মরিচ খুঁটে আঁচলে জড়ো করছে। ঝাড়ু দেয়া শেষ হলে বৌ ঐ সব শাশুড়ির হাতে তুলে দিলো। জামাতারা আন্দাজ করলো নিশ্চয়ই আমি ওকে শিখিয়ে দিয়েছি। এ নিয়ে ওরা খুব মজা পেলো। শিউলীর বিয়ের বৌভাতের দাওয়াতে জামাতা ও আমার ছেলেরা ঝনঝনিয়া গেলো দাওয়াত খেতে। বাড়িতে অনেক ডাব গাছ। গাছে কচি ডাব, জামাতারা ফন্দি করলো ডাব খেতে হবে। সবাই শলা-পরামর্শ করলো। তৈয়ব আলী পেটের ব্যথায় কাতর হলো, বিছানায় গড়াগড়ি দিয়ে কান্না। 'ওরে মাগো মরলাম গো'। বাড়ি ভর্তি মেহমান, সবাই চিন্তড়ায় পড়ে গেলো। কেউ লবণ-পানি খেতে দেয়। কিন্তু ব্যথা সারে না। রোগী আর্তনাদ করে বললো– এ ব্যথা, সে ব্যথা নয়। এ ব্যথা এমনি যাবে না, ডাবের পানি খেতে হবে। অন্য জামাতারাও সায় দিলো। সবাই হাফ ছেড়ে বাঁচলো। ডাব পাড়ার জন্য সবাই ব্যস্তড় হলো। তাড়াতাড়ি ২/৩ কাঁদি ডাব পাড়া হলো। ডাব খেয়ে রোগী সুস্থ হলো। বিয়েবাড়িতে শান্তিড় ফিরে এলো। অসুখের ভান করে

ডাব পাড়ার ব্যবস্থা করলো। অন্য জামাতারা ডাব খেয়ে তৃপ্ত হলো।

রুহুলের বিয়েতে মেয়ের সাথে মেয়ের মা মিষ্টি, নাড়ু, মোয়া দিয়েছেন শাশুড়ির হাতে দেয়ার জন্য। বৌকে ঘোড়ারগাড়িতে তুলে দিয়ে আমরা হেঁটে চলেছি। করটিয়া থেকে ময়থা যেতে তখন কোনো যানবাহন ছিলো না। মিষ্টির হাঁড়ির দায়িত্ব রইলো তৈয়ব আলী ও মামাতো দেবর কাইয়ুমের নিকট। ওরা দল বেঁধে হাঁটে আর যেন কি খায়। আমি টের পেয়ে যাওয়াতে আমাকেও একটা মিষ্টি দিলো। ভাগ্নি জামাতা তৈয়ব আলি, শামছু মিয়া, মামাতো দেবর কাইয়ুম, শৈনা, বাবুল, সাহেব আলী মিলে কিছুদূর হাঁটে, আর সবাই মিলে খায়। আমি তো অবাক! দূরের রাস্ড়া, ওদের বাড়ি যেতে যেতে মিষ্টির হাঁড়ি শেষ। মাঘের পূর্ণ জ্যোৎস্নারাত। খই ফোটা জ্যোৎস্না। ওরা কিছু দূর এগিয়ে ক্ষেত হতে মাটির ঢেলা দিয়ে মিষ্টির পাতিল ভরে নিলো। অন্য কেউ কিছুই জানলো না। বাড়ি গিয়ে বৌ বরণ শেষে খালাতো দেবর শৈনা বউয়ের শাশুড়ির নিকট মিষ্টির পাতিল জমা দিলো। জামাতারা পরেরদিন সবাই বৌয়ের শাশুড়িকে ধরলো। ইষ্টিবাড়ির মিষ্টি সবাইকে দেন। বৌয়ের শাশুড়ি মাচার উপর ধানের বেড়ের ভিতর সযতনে হাঁড়ি লুকিয়ে রেখেছিলো। সাবধানে হাঁড়ি বের করা হলো। জামাতারা মিষ্টি খাওয়ার জন্য সবাইকে একত্রে জড়ো করলো।

মিষ্টির হাঁড়ির বাঁধন খুলতে হলো অনেক কষ্টে; কিন্তু এ কী! হাঁড়িতে কোনো মিষ্টি নেই। বৌয়ের শাশুড়ি সবাইকে দেখালো মিষ্টি নেই, শুধু মাটির ঢেলা। তিনি আঁচ করতে পারলেন এটা কার কাজ। জামাতারা নানাভাবে ব্যাখ্যা দিলো-মামীকে তো মিষ্টির পাতিলই দিয়েছি। আমি নীরবে সবকিছু অবলোকন করলাম। দুপুরে মাছ মারা পর্ব শেষ হলো। রাতে শুরু হলো জামাতাদের নাটক। জামাতা ইব্রাহীম, শামছু, তৈয়ব মিলে অভিনয় করলো পাত্রী নির্বাচন নিয়ে। সবাই মজা পেলো। এতো আনন্দের মধ্যেও বেদনাদায়ক ঘটনা। নায়রী ছেউটির ছোট মামী বিয়েবাড়িতে এসে স্ট্রোক করে প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে মারা গেলেন। বিয়ের আনন্দের রেশ শোকে পরিণত হলো। সবই আলণ্ঢাহর ইচ্ছা।

সোনালিয়ার ভাগ্নি জামাতা শামছু মিয়া অনেক রসের গল্প বলতে পারে। সুমনের বিয়ের রাতে জামাতারা মিলে বর-বধুর বাসরঘরের পাশেই আস্ড়ানা গাড়লো। কাঁসার বাসন ও মুড়ির টিন বাজিয়ে গান শুরু করলো। তাদের উলণ্ঢাসে কেউ

ঘুমাতে পারলাম না।। টিভি রুমে ঢালাই বিছানা করে কালাম, তৈয়ব, আরো অনেকের জন্য শোবার জায়গা করা হলো। সে রাত হৈহলণ্ঢা করেই কাটিয়ে দিলো।

জামাতা শামছু মিয়ার একটি গল্প।

শ্বশুরের সাথে নতুন জামাই আত্মীয়বাড়ি বেড়াতে গেছে। ওর শশুরের শখ তার আত্মীয়-স্বজনকে জামাই দেখানো ও পরিচয় করিয়ে দেয়া । প্রথম গেলেন ওর শ্বশুরের মামাশ্বশুর বাড়ি। যাওয়া মাত্রই বসতে দিলেন। নতুন জামাইকে আপ্যায়নের জন্য কাঁসার গণ্ঢাস থালা ঝকঝক করে মাজা হলো। জামাই দূর থেকে দেখে। আলাপ-পরিচয়ের পর খাবার আসলো দুই থালার বুকে কিছু পায়রার ছাতুর সাথে কুশাইলা গুড়। চৈত্রমাস। এখানে খাওয়া শেষে বিদায় নিয়ে অন্য আত্মীয়বাড়ি গেলো। সেখানেও নতুন জামাইর আগমনে আপ্যায়নের তৎপরতা শুরু হলো। জামাই দেখে, অব্যবহৃত থালাবাসন মেজে পরিষ্কার করা হচ্ছে। যুবক জামাতার প্রথম আত্মীয়বাড়ির ছাতু গুড় পেটে নেই। তার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে। ভাবলো এখানে আপ্যায়নটা ভালোই হবে। পানির জগ, গণ্ঢাস আসলো। কড়ির থালায় করে সেই ছাতু গুড়ের সাথে বিচি কলা। জামাতা ভাবে 'ছাতুরে তুই আসলি কোন পথে'? কী আর করা! আদর তো আর ফেলা যায় না। জামাই-শ্বশুর মিলে আবার ছাতু খেলো।

অন্যদিনের ঘটনা। শ্বশুর আবার প্রস্ড়াব দিলেন, নাগরপুর এক আত্মীয়বাড়ি যাওয়ার জন্য। টাঙ্গাইল হয়ে নাগরপুরের রাস্ড়া তখন ভালো ছিলো না। অনেক কষ্টে তারা নাগরপুর পৌঁছলো। সে বাড়ির লোকজন খুব সমাদর করে বসালো। অযুর পানি দিলো। শ্বশুর সবার সাথে জামাইকে পরিচয় করে দিলেন। প্রথমে শরবত দিয়ে আপ্যায়ন করা হলো। দুপুরবেলা। মেহমানদের জন্য খাবার তৈরি হচ্ছে। জামাই বৈঠকখানা থেকে দেখলো অনেকগুলো ডিম সিদ্ধ করা হয়েছে। জামাই ভাবলো– এরা অনেক লোক। আমরা দুজন মেহমান। হয়তো বা ডিম ফালি করে দেয়া হবে। কিন্তু খাওয়ার সময় দেখা গেল ভাজি, ডাল আর আস্ড় একটা করে ডিম পরিবেশন করা হচ্ছে। জামাই মনে মনে খুশি হলো।

বাড়ি এসে গল্প করলো। এক আত্মীয়বাড়ি গিয়েছিলাম; তারা আস্ড় একটা করে আন্ডা দিয়েছে আমাদের। কী আত্মা গো! আর কী বড়লোক!

আসলে ছাতু গুড় কলা আস্ড় ডিম সত্য এই গল্পটা জামাতা শামছু খুব

উপভোগ্য করে বর্ণনা করেছিলো। আমি খুব হেসেছিলাম।

আমাদের একমাত্র জামাতা আব্দুল মোত্তালিব সোনালী ব্যাংকের এজিএম। একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আদর্শ মানুষ। বাংলাদেশ সরকারের একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা। আদর্শ ও র্লচিশীল তার গৃহ ব্যবস্থাপনা। ভ্রমণবিলাসী, সৌখিন অতিথিপরায়ণ ও বন্ধুবৎসল। আমি সকলের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি।

বক্ষে আমার কাবার ছবি

পুবান হাওয়া পশ্চিমে যাও কাবার পথে বইয়া
যাওরে লইয়া এই গরীবের সালামখানি লইয়া।

সেই যে ছোটবেলার মরমী শিল্পী আব্বাস উদ্দীনের গান শুনে মনের ভিতর কাবার প্রতি আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা জন্মেছিলো, তা একদিন সত্যি করে রূপ লাভ করলো। অন্যান্য হাজীদের নিকট পবিত্র মক্কা ও মদিনা শরীফের গল্প শুনে মনে যে দুর্বার আকর্ষণ জন্মেছিলো, তা আলণ্ঢাহর অসীম করর্ণা ও রহমতে বাস্ড়বে রূপ নিলো। ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে সেই আরাধ্য সাধনাকে উপভোগ করে নয়ন জুড়ালো, দেহমন পবিত্র হলো। আমার স্বামী ছাদের আলী সাহেব, জেলা শিক্ষা অফিসার, টাঙ্গাইল। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার পর পবিত্র হজ্বব্রত পালনের সিদ্ধান্ড় নিলেন।

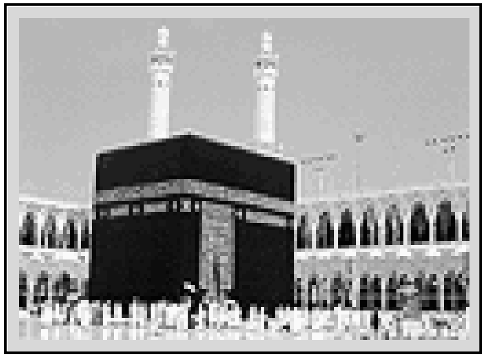

আমি আমার স্কুল থেকে ৪০ দিনের ছুটি নিলাম। হজে যাবার নানা আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলো। আমাদের মৌলবী শিক্ষক হাজী মৌলবী আব্দুর রহমান নানা সময়ে হজের নিয়মকানুন সম্বন্ধে আমাদের ধারণা দেন। নানা আয়োজনে হজের প্রস্তুতি চলতে থাকলো। আমাদের গ্রর্লপের নাম ‘আলটিমেট এয়ার ইন্টারন্যাশনাল হজ’, এজেন্ট নং ১৪৭। ঐ গ্রর্লপের আমির সিরাজুল ইসলাম এবং গ্রর্লপ প্রধান ছিলেন আলহাজ মোহাম্মদ জুনাইদ। সৌদি এ্যারাবিয়ান এয়ার লাইন্সের সর্ববৃহৎ বিমান আমাদের জন্য নির্ধারিত ছিলো। ১৬ জানুয়ারি ২০০৫ হজের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যাত্রা। ঐ দিন আমরা ঢাকা হাজীক্যাম্পে উপস্থিত হলাম। খবর পাওয়া গেলো আমাদের জন্য নির্ধারিত বিমানটি এখনো ঢাকা এসে পৌঁছায় নাই। রাতে ক্যাম্পের নিকট মেজবৌ বন্যার বান্ধবী কান্ড়ার বাসায় অতিথি হলাম। কান্ড়া ও ওর শাশুড়ি যথেষ্ট আন্ড়রিকতার সাথে আমাদের গ্রহণ করলো। ভোর রাতে গোসল সেরে আমরা

ইহরাম পরিধান করলাম। ঘর হতে বের হওয়ার সময় দোয়া পড়ে নিলাম।

‘বিসমিল-াহি তাওয়াকালতু আলাল-াহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল-াবিলণ্ঢাহ’। মেজো ছেলে সুমন, বৌ বন্যা ও মেয়ে শিউলী আমাদের এয়ারপোর্ট পর্যন্ড় পৌঁছে দিয়ে গেলো। ১৭ই জানুয়ারি সৌদি বিমানটি ঢাকা এয়ারপোর্টে পৌঁছলো। বিমানবন্দরে হাজীদের অফিসিয়াল আনুষ্ঠানিকতা শেষে রাত ১০টায় আমরা সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। দেহ শিহরিত, মন রোমাঞ্চিত হলো। সত্যিই আমার স্বপ্নের শহর মক্কা ও মদিনা যাওয়া এই তো সার্থক হতে চললো। আলণ্ঢাহর নিকট শোকরিয়া জানালাম- ইয়া আল-াহ, তুমি আমাদের হজ নসিব করো, পরিপূর্ণভাবে হজ পালন করার তৌফিক দাও।

সৌদি এয়ারলাইন্সের বৃহৎ যন্ত্রকপোতটি উড্ডয়নের পূর্বে দীর্ঘসময় ধরে বিকট শব্দে গর্জে ওঠলো। স্বপ্নের সিঁড়ি বেয়ে কল্পলোকের শহর মক্কা ও মদিনা আমার মানসচোখে উদ্ভাসিত হলো। যাত্রা হলো শুর“। বিমানে ওঠেই দোয়া পড়লাম– “বিসমিলণ্ঢাহি মাজরিহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রাব্বি লা গাফুফুর রাহীম”। আমার জীবনে প্রথম বিমান ভ্রমণ। আমরা স্বামী-স্ত্রী দুজন জানালার কাছে সিট পেলাম। নিশাচর যন্ত্রকপোতটি উন্মুক্ত তারকাখচিত রাতের আকাশে পাখা মেললো। আমরা সিট বেল্ট বেঁধে নিলাম। যন্ত্রদানবের নিকট শব্দ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কানে তুলা গুঁজে নিলাম। একসময় বিমানটি উর্ধ্বাকাশে শো শো করে উড়ে চললো। বিমানে কেবিন সার্ভিস অনেক উন্নতমানের। কেবিন ক্রুগণ ¯স্নিগ্ধ শ্যামশ্রী, ইউনিফর্ম পরা তর“ণী ও যুবক স্টুয়ার্ড প্রফুলণ্ঢ বদনে আমাদের স্বাগত জানালো। আপন আত্মীয়ের মতোই আমাদের সেবাদানের জন্য এগিয়ে এলো। কিছুক্ষণ পরপরই বিমান কর্তৃক খাদ্য পরিবেশিত হলো। খাদ্য যদিও উন্নতমানের, তবুও আমরা অভ্যস্ড় নই বিধায় আগ্রহ ভরে খেতে পারলাম না। বিস্কুট ও চা-কফি পান করেই তৃপ্ত হলাম। বিমানবালা ও স্টুয়ার্টগণ একটু পরপরই আমাদের অসুবিধার কথা জানতে চান। যে কোনো সাহায্যের জন্য তারা সহাস্য বদনে এগিয়ে আসেন।

ক্রমে রাত গভীর হতে থাকলো । যন্ত্রকপোতটি ৩০/৩৫ হাজার ফুট উর্ধ্ব আকাশে উড়ছে। খোলা জানালা দিয়ে নিচের আঁধার রাতের অপরূপ শোভা অবলোকন করলাম। সময় যতই বাড়ছে বিমানের গতিবেগও তত বাড়ছে। এই তো আরব সাগর পাড়ি দিতে চলেছি। নীচের সাগরের নীলাভ জল আরও মিশকালো নীল দেখাচ্ছিলো। সে দৃশ্য নয়ন-মন ভরে উপভোগ করলাম। এ্যারাবিয়ান সুদর্শন স্টুয়ার্ট যুবক একসময় মধুর কণ্ঠে “লাব্বাইকা, আলণ্ঢাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা, ওয়ান্নিয়া মাতা লাকা ওয়ালমুলক, লা শারীকা লাক”, সুমধুর কণ্ঠে পাঠ করতে থাকলো।

আমরাও তার সাথে পাঠ করতে থাকলাম। এ যেন এক অপূর্ব সুরের মূর্ছনা। হজযাত্রীদের মুখ থেকে নিঃসৃত সে বাণী উর্ধ্বাকাশে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। হজযাত্রীদের মুখে স্বতঃউৎসারিত ‘লাব্বাইকা’ ধ্বনিতে আগত ভোরের আকাশ-বাতাস মুখরিত হলো। রাত ৪টার দিকে বিমানের টিভি মনিটরে ভেসে ওঠলো বিমানটি কিছুক্ষণের মধ্যই জেদ্দা বিমানবন্দরে অবতরণ করবে। জেদ্দা বিমানবন্দরে এই দোয়া পড়তে হয়– ‘রাব্বি আদখিলনী ওয়া আখরিজনী মুখরাজা সিদকিন, ওয়াজ আল লী মিলণ্ঢাদুনকা সুলতানান নাছিরা অর্থাৎ হে আমার প্রতিপালক, আমাকে প্রবেশ করান কল্যাণের সাথে আর আমাকে বের করাবেন কল্যাণের সাথে। আর আমাকে দিবেন আপনার নিকট থেকে সাহায্যকারী শক্তি।

জেদ্দা বিমানবন্দরে অবতরণ করে বিশ্রামকক্ষে যখন প্রবেশ করলাম তখন ভোর। বিমানবন্দরের আনুষ্ঠানিকতা সারতে সহমোয়ালেণ্ঢম সাহেব তৎপর হলেন। হজযাত্রীদের সুবিধার্থে জেদ্দা বিমানবন্দরে প্রত্যেক মুসলিম রাষ্ট্রের পতাকা দিয়ে এরিয়া চিহ্ন করা আছে। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্ড়ানের পতাকা পাশাপাশি উড়ছে। আমরা বাংলাদেশের তাঁবুর নিচে আস্ড়ানা পাতলাম। জেদ্দা লোহিতসাগর তীরে অবস্থিত সৌদি আরবের সমুদ্রবন্দর। জেদ্দা বাদশাহ আব্দুল আজিজ বিমানবন্দরটি বিস্ড়ীর্ণ এলাকা জুড়ে অবস্থিত। হজ টার্মিনালটির নির্মাণ সৌন্দর্য আকর্ষণীয়। মক্কাগামী বাস আসতে দেরী হওয়াতে বিমানবন্দরটি ঘুরে দেখার সুযোগ হলো। ননদ জোবেদাকে সঙ্গে নিয়ে কিছুক্ষণ ঘুরে দেখলাম।

আশা-আনন্দের ব্যঞ্জনা চোখে-মুখে। এইতো আলণ্ঢাহর ঘর অতি নিকটে। নবী (স.) এর পূণ্য জন্মভূমি পবিত্র মক্কা এই তো সম্মুখে। ভোর থেকেই বিকাল পর্যন্ড় জেদ্দা থেকে বাসে হজযাত্রীদের মক্কা পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। আমরা সন্ধ্যা নাগাদ জেদ্দা বিমানবন্দরে অপেক্ষা করার পর আমাদের জন্য নির্ধারিত বাসটিতে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম। মুয়ালিণ্ঢম অফিসে আমাদের একটি ব্যাজ দেয়া হয় ঘড়ির মতো হাতে পরার জন্য। এতে আরবি ও ইংরেজিতে মুয়ালিণ্ঢমের নাম-ঠিকানা লিপিবদ্ধ ছিলো। এখানে নাস্ড়ার জন্য আমাদের এক প্যাকেট বিস্কুট, আপেল ও এক বোতল করে মিনারেল ওয়াটার দেয়া হলো। এখানে আতিথ্যের নতুন পরশ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে হলো। সন্ধ্যার পর বাস আমাদের মক্কার মিছফালাহ এলাকায় নামিয়ে দিলো। এখানে আমাদের জন্য নির্ধারিত বাসায় আমরা পৌঁছে গেলাম। সেখানে প্রধান মুয়ালেণ্ঢম জুনায়েদ

সাহেব আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

সেদিন ছিলো ৭ই জিলহজ। ভ্রমণের ক্লান্ড়ি ভুলে একজন এ্যারাবিয়ান গাইড সাথে নিয়ে আমরা আলণ্ঢাহর ঘর তওয়াফ করতে ওমরাহর উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমাদের বাসা থেকে কাবাঘর মাত্র ৫/৭ মিনিটের রাস্ড়া। কী আনন্দ! কী সুখ! আলণ্ঢাহর ঘর আমার সন্নিকটে। সঙ্গী হাজী সাহেবগণ এক কাফেলায় 'আল- াহু আকবর' ধ্বনি মুখে অনুরণিত করে কাবার উদ্দেশ্যে চললাম। কিছুদূর এগোতেই বক্ষে অঙ্কিত ছবি নয়ন পাতে উদ্ভাসিত হলো। 'লাব্বাইক আলণ্ঢাহুম্মা লাব্বাইক'। একী স্বপ্ন না বাস্ড়ব! লাখো শুকরিয়া আল- াহর নিকট। তিনি পরম দয়ালু রাহমানুর রাহীম; ধন্য আমার জীবন। সেদিনের সেই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই।

গাইডের পিছনে তালবিয়া পড়তে পড়তে মসজিদুল হারামে প্রবেশ করলাম। আলণ্ঢাহর ঘরে প্রবেশকালে ডান পা আগে দিতে হয়, বের হওয়ার সময় বাম পা আগে দিতে হয়। প্রবেশকালে দোয়া: "হে আলণ্ঢাহ! আমার সমস্ড় গোনাহ মাফ করে দাও, আমার জন্য তোমার রহমতের দরজাগুলো উন্মুক্ত করে দাও।" সহকর্মী আলহাজ আবুবকর সাহেব বলে দিয়েছিলেন- দক্ষিণ দিকের দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে। আমরা ৯০/৯১ নং দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছি। আল- াহর গৃহদ্বারে আমি এখন সমুপস্থিত। সকল মুসলিমের কাঙ্ক্ষিত নয়নাভিরাম কাবা আমার সম্মুখে। 'আল- াহ আকবর, আল- াহু আকবর, লা ইলাহা ইল- াল- াহু ওয়াল- াহু আকবর' বলে কাবাগৃহ দৃষ্টিগোচর হওয়ামাত্র পড়তে হয়। লাব্বাইক, আলণ্ঢাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বায়কা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নিয়মাতা লাকা ওয়ালমূলক, লা শারীকা লাক।

রাত গভীর। 'লাব্বাইক' ধ্বনির গম্ভীর কলরোলে মক্কার আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সমুদ্রের গর্জনের সাথে সেই শব্দের তুলনা করা যায়। আহা কী শান্ড়ি! স্নিগ্ধ ধ্বনি সেই পবিত্র বাণীর। আমরা গাইডের সাথে তওয়াফের প্রস্তুতি নিলাম। কাবাঘরের দিকে মুখ করে নিয়ত করতে হয়। নিয়ত: 'হে আল- াহ, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য তওয়াফ করছি, তুমি আমার জন্য এটা সহজ করে দাও এবং কবুল করো'। তাকবিরে তাহরিমার মতো কান পর্যন্ড় হাত ওঠিয়ে পড়তে হয়- 'বিসমিল- াহি আল- াহ আকবর'। তারপর সম্ভব হলে হজরে আসওয়াদ দুহাতে স্পর্শ করে চুমো দিতে হয়। সম্ভব না হলে দূর থেকে ইশারায় চুমো দিতে হয়। তওয়াফের সময় নীচের দিকে তাকিয়ে বলতে হয়,

'লা ইলাহা ইল- াল- াহু ওয়াহ দাহু লা শারীকা লাহু। লাহু ওয়ালমূলক ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলণ্ঢাকুলিণ্ঢ শাইয়্যিন কাদীর'। তারপর যেখানে চক্কর প্রায় শেষ, র ্কনে ইয়ামানির দিকে অগ্রসর হয়ে একটু আগে থেকেই পড়তে হয়- 'রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান্নার। ওয়াদ খিলনাল জান্নাতা মা আল আবরার। ইয়া আজিজু, ইয়া গাফফার ্, ইয়া রাব্বাল আলামীন।' এইভাবে ৭ চক্কর শেষে ৮ম বার হাত ইশারায় চুমো খেতে হয়। এভাবে ওমরাহ হজের তওয়াফ শেষ করে ২ রাকাত তওয়াফের নামায পড়ে যমযমের পানি পান করে মনে প্রশান্ড়ি ফিরে এলো। পানি পান করার দোয়া– 'হে আলণ্ঢাহ! আমি তোমার নিকট ফলপ্রসূ ইলম, সচ্ছল জীবিকা এবং সকল রোগের নিরাময় কামনা করছি। তিন চুমুকে পানি পান করতে হয়। প্রতিবার পড়তে হয়। 'বিসমিল- াহি ওয়ালহামদুলিল- াহি ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসুলিল- াহ'।

আমরা আমাদের গাইডের সাথে সায়ী করার উদ্দেশ্যে সাফা পাহাড়ের প্রান্ড়ে দাঁড়িয়ে নিয়ত করলাম- 'হে আলণ্ঢাহ, আপনার সন্তুষ্টির জন্য সাফা-মারওয়া ৭ চক্করের নিয়ত করছি। আপনি আমার জন্য তা কবুল করে নিন এবং আমার জন্য তা সহজ করে দিন।' সাফা পাহাড় থেকে কাবাঘরের দিকে মুখ করে দোয়া পড়তে হয়-লা ইলাহা ইল- াল- াহু ওয়াহদাহ লা শারীকা লাহু লাহু ওয়াল মূলক ওয়া লাহুল হামদু য়ুহয়ী ওয়ায়ুমীতু বিয়াদিহিল খায়র ্, ওয়া হুয়া আলাকুলি- সাইয়্যিন কাদীর'। সাফা-মারওয়া স্থানটি হযরত ইব্রাহীম (আ.) ও বিবি হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাইল (আ.) এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ইব্রাহীম (আ.) স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে সামান্য খাবার ও পানি দিয়ে এই নির্জন স্থানে রেখে সিরিয়া চলে যান। হাজেরার দৃষ্টির আড়ালে গিরি পর্বতের নিকট দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেন– 'হে আমার প্রতিপালক, আপনার সম্মানিত গৃহের নিকট আমার বংশধরদের রেখে যাচ্ছি এ জন্য, তারা যেন সালাত প্রতিষ্ঠা করে। আপনি কিছুলোকের অন্ড়র তাদের দিকে আকৃষ্ট করে দিন; আর ফলাদি দ্রব্য দিয়ে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দিন। যাতে তারা আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (সূরা ইব্রাহীম) হযরত ইব্রাহীমের দেয়া খাবার পানি শেষ হয়ে গেলে মাতা ও শিশুপুত্র কাতর হয়ে পড়েন। ক্রন্দনরত শিশুর ক্ষুৎপিপাসা নিবারণের জন্য মমতাময়ী মাতা অস্থির হয়ে পড়েন। মাতা হাজেরা কণ্টকাকীর্ণ উচু-নীচু পাহাড়ে ত্রস্ড় হরিণীর মতো ছুটোছুটি করতে থাকেন। ক্রন্দনরত শিশুর দিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তার নিরাপত্তা খেয়াল করেন। পানির আশায় ৭ বার তিনি উক্ত

পাহাড়দ্বয়ে ওঠানামা করেন। দ্রুত চলা-ফেরার সন্ধিক্ষণে এক আগুন্তুকের পায়ের আওয়াজ শুনতে পান, কে যেন শিশুর পায়ের কাছে আঘাত করছে। নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গের মতো মাতা দেখলেন পুত্রের পদতলে আল্লাহর অপূর্ব করুণাধারা উপচে পড়ছে। মাতা হাজেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠলেন, যমযম, অর্থাৎ থামো থামো। আর সাথে সাথে পানির চারদিকে বাঁধ দিলেন। আর তা সাথে সাথে রূপ নিলো গভীর কূপের। অঞ্জলি ভরে পান করালেন শিশুকে সেই পবিত্র পানি; নিজেও পান করলেন। কালক্রমে সেখানে বণিকদের ব্যবসাকেন্দ্র ও জনপদ গড়ে ওঠে। বিবি হাজেরার স্মৃতি বিজড়িত সাফা-মারওয়া' সায়ী করার সময় হাজীগণ তার দুর্যোগ ও কষ্টের কথা স্মরণ করে এবং পরম করুণাময়ের অসীম রহমতের কথা স্মরণ করে ৭ বার সায়ী করেন।

যমযম কূপটি সলিলামৃত পানকারীর জন্য আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এমন সুন্দর ব্যবস্থা কেবল মহান আল্লাহর অনুগ্রহেই সম্ভব হয়েছে।

আল্লাহর অশেষ রহমতে ৭ই জিলহজ আমরা ওমরাহ শেষে প্রশান্ত পরিতৃপ্ত মনে বাসায় ফিরে এলাম। ৭ই জিলহজ মক্কা থেকে মিনায় অবস্থান। মিনায় যোহর আসর মাগরিব, এশা ও রাত শেষে ফযরের নামায পড়ে আরাফাতের মাঠের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সেদিন ছিল ৯ই জিলহজ।

৯ই জিলহজ আরাফার দিন। আজ মূল হজ। ঐ দিন আল্লাহ তায়ালা প্রথম আসমানে নেমে আসেন। যোহরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এখানে অবস্থান করা ফরয। দোয়া কবুলের সর্বোত্তম স্থান ও সময়। সহমুয়াল্লিম হাজী সিরাজ সাহেব আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। যোহরের নামাযের পূর্বেই আমরা আরাফায় উপস্থিত হলাম। এই সেই আরাফা যেখানে কাল কিয়ামতের মাঠ হবে। সেই প্রান্তরে দাঁড়িয়ে কেবলি মনে হচ্ছিল- ইয়া আল্লাহ, কিয়ামতের মাঠে তুমি আমার হিসাব-নিকাশ সহজ করে দিও। নবী (স.) এর সাফায়াত দান করো, হাউজে কাওসারের অমৃত বারি পান করাইও। তুমি আমাকে এখানে আসার তৌফিক দান করেছো। তোমার নিকট লাখো শুকরিয়া। আমার সকল গুনাহ মাফ করো।' আরাফার মাঠে বেশি বেশি তাকবির তাশরিক পড়তে হয়। "আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর ওয়ালিল্লাহিল হামদ।" আরাফার মাঠে অবস্থানকালে দোয়া দরুদ, কালেমা বেশি বেশি পড়তে হয়। এই আরাফার মাঠেই দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়ার গুনাহ মাফও পুনর্মিলন হয়েছিলো। ঐ তো দেখা যায় দোয়া কবুলের স্থান 'জাবালে রহমত'।

এখানে দাঁড়িয়ে হযরত আদম (আ.) প্রার্থনা করেছিলেন- রাব্বানা জালামনা আনফুসানা ওয়া ইনলাম তাগফিরলানা ওয়া তারহামনা লানা কুনান্না মিনাল খাসিরীন'। এখানে দাঁড়িয়ে কল্পনায় হযরত আদম (আ.) ও হযরত হাওয়ার মিলন দৃশ্য অন্তরে অনুভব করেছি। আরাফার মাঠে আল্লাহ দোয়া কবুলের জন্য ওয়াদা করেছেন। যোহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নামায তেলাওয়াত, কালেমা দরুদ পড়ে আল্লাহর শাহী দরবারে নিজের জন্য, পরিবারের জন্য দোয়া করতে হয়। আরাফার দিন সূর্যাস্তের সময় 'বিসমিল্লাহ মাশ আল্লাহু লা হাওলা ওয়ালা কুয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিউল আযীম'- এই দোয়া পাঠকারীকে আল্লাহ মর্যাদা সহকারে বেহেশতে দাখিল করবেন। (আল হাদিস) আরাফার দিনে আল্লাহতায়ালা প্রথম আসমানে নেমে আসেন। যোহরের পর থেকে ৯ই জিলহজ সূর্যাস্তের পর মুজদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও এশা একসাথে আদায় করে নিলাম। এখান থেকে বুট দানার ৭০টি পাথর সঙ্গে করে নিলাম কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে। ফজরের নামায পড়েই মীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা। মীনায় যাওয়ার পথে তওবা ইস্তেগফার পড়তে হয়। কংকর নিক্ষেপের পূর্বে তালবিয়া পাঠ বন্ধ। কংকর নিক্ষেপের দোয়া- বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবর'। ১০ই জিলহজ তওয়াফে যিয়ারত। মক্কায় তওয়াফে জিয়ারত ফরয। ১০ই জিলহজ ঈদের দিন। কোরবানি করার পর পুরুষ হাজীগণ মাথা মুন্ডন করেন। ১১ ও ১২ তারিখ মেজো ও বড় শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ করে মক্কায় ফিরে আসি।

হজের আগে বা পরে হাজিগন জাবালে নূর যেখানে নবী (স.) ধ্যান করতেন যেখানে পবিত্র কোরানের আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে সেই স্থান দর্শন করেন। জবালে নূর-গারে সত্তর, সাফা-মারওয়া মক্কার লইব্রেরী, যাদুঘর, কাবার গিলাফ তৈরীর কারখানা, জাবালে রহমত (আরাফায়), মিনার আল খায়েফ মসজিদ নামিরা মসজিদ, আরাফাতের মাঠ, জাবালে সাওর প্রভৃতি নবী (স.) এর স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহাসিক ধর্মীয় স্থান দর্শন করে থাকেন। মক্কার উম্মুল জুদ এলাকায় কাবার গিলাফ তৈরীর কারখানা। সেখানে অনেক বাংলদেশী চাকরি করে। উমরা মসজিদে (হযরত আয়শার) যাওয়ার পথেই চোখে পরে মক্কার যাদুঘর। ঘরে ঢুকলেই চোখে পড়ে ইতিহাস ঐতিহ্য আর ইসলামি সংস্কৃতির নিদর্শন। এসব দর্শনীয় স্থান ইসলামের গৌরব উজ্জল দিনগুলোর কথা আরেকবার মনে করিয়ে দেয়।

বিদায়ী মুনাজাত মক্কায়:

হে আলণ্ঢাহ! তোমার পবিত্র কাবাগৃহ ছেড়ে যাচ্ছি। আমি তোমার পবিত্র কাবাগৃহ জিয়ারত করলাম। এর সমস্ড় ভুল-ত্রূটি মেহেরবানি করে মাফ করে দাও। হে কাবা গৃহের প্রভু, জীবন মরনের মালিক তোমার অনুগ্রহের দরজা আমার জন্য খুলে দাও। আমার হজকে কবুল করে নাও। হে আলণ্ঢাহ আমার এই যাওয়া যেন শেষ যাওয়া না হয়। তোমার পবিত্র গৃহের ধুলি গায়ে মাখবার সামর্থ্য ও সম্বল আমাকে দিও। হযরত ইব্রাহিম ও ইসমাইলের কাবাগৃহ, মাকামে ইব্রাহিমে দাঁড়িয়ে তোমার নিকট পানাহ চাই। এটা দোয়া কবুলের স্থান। আমার দোয়া তুমি কবুল করো। পৃথিবীর সকল মোমিন নর-নারীকে তুমি হেফাজত করো ও ক্ষমা করো। আমার একটি গোনাহ জীবিত থাকতে তুমি আমাকে দুনিয়া থেকে তুলে নিও না। ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল দান কর। মৃত্যুর আযাব থেকে মুক্তি দিও। কবরের আযাব ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিও। দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করো। হে কাবা গৃহের মালিক আমার সকল প্রার্থনা তুমি কবুল কর। আমার হজকে মকবুল হজে পরিনত করো। সহি সালামতে পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যাওয়ার তৌফিক দান কর। বেঁচে থাকলে আবার তোমার পুণ্য ভূমি মক্কা ও নবী (স.) এর স্মৃতি বিজড়িত মদিনা শরীফ জিয়ারত করার আকাঙ্ক্ষা রাখি। আমিন।

মক্কা থেকে বিদায়ের পূর্বে একটি বিদায়ী তওয়াফ শেষে বিদায়ের বিরহ নিয়ে ভক্তি করে, অশ্রূসিক্ত নয়নে সম্ভব হলে কাবাঘরের দরজা আঁকড়িয়ে ধরে বুক মিলিয়ে হজ কবুল, পিতামাতা আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীর জন্য প্রাণ ভরে দোয়া করতে হয়। আমরা ব্যথাতুর হৃদয়ে মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

জিয়ারতে মদিনা

মদিনা শরীফ ও রওজা মোবারক জিয়ারত

হজের আগে বা পরে সুবিধামতো সময়ে হাজীগণ মদিনা শরীফ যান। সেখানে রসূল করিম মুহম্মদ (সা.) এর পবিত্র রওজা মুবারক, রিয়াজুল জান্নাত এবং জান্নাতুল বাকী জিয়ারত করেন। ঐতিহাসিক উহুদ পাহাড় ও বদর প্রান্ড়র দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

এই স্থানগুলো প্রিয়তম রসূল (স.) এর পবিত্র বহু স্মৃতি জড়িত আছে। মদিনা শরীফে মসজিদে নববীতে নামায আদায় করা ও রসূলে করীমের (সা.) রওজা শরীফ জিয়ারত করাই উত্তম। নবী (সা.) এর রওজায় আদব ও বিনয়ের সাথে সালাম দেয়া কর্তব্য। এর পাশে রয়েছে হযরত আবুবকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) এর কবর। পর্যায়ক্রমে আবুবকর ও হযরত উমরের উদ্দেশ্যে সালাম পেশ করতে হয়। মসজিদে নববীতে ৮দিন অবস্থান করে ৪০ রাকাত নামায পড়া সুন্নত। মদিনায় রওজা জিয়ারত হজের অংশ নয়। প্রেমভক্ত নবী (স.) এর প্রেম পাগল উম্মত তার রওজা জিয়ারত করে অশেষ সওয়াব অর্জনের জন্য গিয়ে থাকেন। ভিড়ের কারণে আমরা প্রথম দিন রওজা জিয়ারত করতে পারিনি। পরের দিন নবী (স.) এর রওজা জিয়ারতের সৌভাগ্য হয়েছে ও রিয়াজুল জান্নাতে দুই রাকাত নামায পড়েছি।

ঐ তো দেখা যায় মদিনার মসজিদের মিম্বর, যেখানে হযরত জিব্রাইল (আ.) বহুবার ওহী নিয়ে নবীর কাছে এসেছেন। এই সেই মিম্বর, যেখানে হযরত

বেলাল সুললিত কণ্ঠে আযান দিয়েছেন। এইসব স্মৃতি বক্ষে ধারণ করে মদিনা শরীফের চারপাশে ঘুরেছি।

মদিনা একটি প্রসিদ্ধ শহর। কাফেরদের অত্যাচারে নবী (স.) মক্কা থেকে মদিনায় হিযরত করেন। তাওহীদের বাণী প্রতিষ্ঠা করেন। স্বয়ং আলণ্ঢাহ তার হাবীবের জন্য এই শহরকে হিজরতের জন্য নির্বাচন করেন। এখানে কোরআন শরীফের বহু আয়াত ও সূরা নাযিল হয়েছে। এই শহরের অলিতেগলিতে তাওহীদের বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

এখানে নবী (স.) এর পবিত্র রওজা মোবারক রয়েছে। সকল হজ যাত্রীগণ হজের আগে বা পরে এখানে এসে রওজা জিয়ারত করে থাকেন। পূণ্যভূমি মদিনা ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও হাজীদের নিকট অতিপবিত্র ও স্মৃতিময় স্থান। সবুজ গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদে নববী নজরে পড়ামাত্রই হৃদয়ের আবেগ ও নবীর প্রতি মহব্বত নিয়ে প্রবেশ করা উত্তম। প্রবেশ কালে প্রথমে ডান পা রেখে সালাম পাঠ করতে হয়- 'বিসমিল- াহি ওয়াসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসুলিল- াহ। আল- াহুম্মাগ ফিরলী যুনুবী ওয়াফ তহলী আবওয়াবা রাহমাতিক।' বাবে জিব্রাইলের নিকট সাদা কার্পেট চিহ্ন করা স্থানটি রিয়াজুল জান্নাত বা বেহেশতের টুকরা। এখানে ২ রাকাত নামায পড়ে দোয়া করতে হয় 'হে আল- াহ, অসংখ্য দর ্দ ও সালাম নবী (স.) এর উপর বর্ষিত হোক। আলণ্ঢাহ আমার গোনাহ মাফ করে দাও। এখানে আমি যে দোয়াই করি, তার ভুলত্র ্টি ক্ষমা করে দাও। নবী (স.) এর উছিলায় অনুগ্রহপূর্বক তা কবুল করো। শাফায়াতের দোয়াঃ আলণ্ঢাহুম্মা সালিণ্ঢ আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন সালাতান তামনাহুনা বিহা কুরবাতাহু ওয়া শাফায়াতাহু।'

হাদিসে উলেণ্ঢখ আছে- রসূল সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢামের রওজার পাশে দাঁড়িয়ে যে ব্যক্তি ইলণ্ঢালণ্ঢাহু ওয়া মালায়ি কাতিহু আলাইকা ইয়া মুহাম্মদ' পাঠ করে তার উপর আলণ্ঢাহর অশেষ রহমত নাযিল হয়, তার সকল মকসুদ পূরণ হয়।

২। হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে- রসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কবর জিয়ারত করবে, কিয়ামতের মাঠে তার জন্য আমার শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

৩। আরও বর্ণিত আছে নবী (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পর আমার রওজা মোবারক জিয়ারত করলো, সে যেন আমার জীবদ্দশায়ই আমার রওজা জিয়ারত করলো।

৪। হাদিসে আরও উলেণ্ঢখ আছে নবী (স.) বলেছেন- যে ব্যক্তি বায়তুলণ্ঢাহ

শরীফে হজ করলো, অথচ আমার কবর জিয়ারত করলো না; সে অবশ্যই আমার উপর জুলুম করলো।

৫। হযরত আবু হোরায়রা থেকে বর্ণিত আছে- নবী (স.) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার রওজার পাশে দাঁড়িয়ে আমার নামে দর ্দ পাঠ করে, আমি তা শ্রবণ করে থাকি এবং অন্যস্থানে থেকেও যে দর ্দ পাঠ করে তার দুনিয়া এবং আখিরাতের সকল মকসুদ পূর্ণ হয় এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো এবং তার পক্ষে সাক্ষ্য দান করবো।

মক্কা ও মদিনা শরীফ থেকে বিদায়ের পূর্বে বিশেষ করে মক্কা ও মদিনায় মুনাজাতের আগে কায়মনোবাক্যে নীচের অযিফা করে মোনাজাত করতে হয়। যার জীবনে হজ নসিব হয়েছে, এই হজকে মকবুল হজে পরিণত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত। বলা তো যায় না, জীবনে আর যাওয়ার সুযোগ ও সাধ্য নাও হতে পারে। তাই বিদায়ের আগে নিলিখিত দোয়া পাঠ করে মুনাজাত করা অতি উত্তম।

সূরা ফাতিহা ১ বার
৩ বার সূরা কাফের ্ন, এখলাস, নাস ও সুরা ফালাক
বেশি বেশি আসতাগফির ্লণ্ঢাহ
১ বার আয়াতুল কুরসী
১০ বার সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রাব্বুনা রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়ার ্হ
১০ বার সোবহানাল- াহি ওয়া বিহামদিহী
৭ বার আলণ্ঢাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার (দোযখ থেকে মুক্তির দোয়া)
৮ বার আলণ্ঢাহুম্মা ইন্নি আসআলুকাল জান্নাত (বেহেশ্‌ত লাভের দোয়া)

মদিনায় বিদায় মোনাজাত

আলহামদুলিলণ্ঢাহ, আলহামদুলিলণ্ঢাহ। হে আলণ্ঢাহ, সকল প্রশংসা আপনার জন্য। আপনার অশেষ রহমতে মক্কা শরীফ তওয়াফ ও মদিনা শরীফ জিয়ারত করার সৌভাগ্য হয়েছে। আপনি আমার এই তওয়াফ এবং জিয়ারত কবুল কর ্ন। আমার এই হজকে মকবুল হজে পরিণত কর ্ন। হে আলণ্ঢাহর রসূল, বিদায় নিচ্ছি, ছেড়ে যাচ্ছি আপনাকে, আমার এই যাওয়া যেন শেষ যাওয়া না হয়। আমি আপনার নিকট আলণ্ঢাহর রহমতে শাফায়াত ভিক্ষা চাই। আলণ্ঢাহর কাছে আপনি আমার জন্য সুপারিশ করে দিন। আমি আপনার নিকট

সুপারিশ প্রার্থনা করি। হে আল- াহর রসূল, আপনার প্রতিষ্ঠিত সত্য ধর্মের উপর যেন প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি। আপনার মহব্বতের উপর যেন মরতে পারি।

'আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসূলিল- াহ', আমার মাধ্যমে যারা আপনার নিকট সালাম পেশ করেছে তাদের জন্যে আলণ্ঢাহর রহমত, আপনার মহব্বত ও শাফায়াত ভিক্ষা চাই। বিদায় নিচ্ছি, হে আলণ্ঢাহর রসূল, ছেড়ে যাচ্ছি আপনাকে। আলণ্ঢাহ যেন আমার এই জিয়ারতকে আপনার সামনে উপস্থিতিকে শেষ ঘটনা না করেন। হে আলণ্ঢাহ, আমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ শান্তি দান করো, নিরাপদে পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যাবার তৌফিক দান করো। "বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।" হে আলণ্ঢাহর রসূল, খাস করে আমার আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশি যারা আমার মাধ্যমে আপনার নিকট সালাম ও দরূদ পাঠিয়েছে, আলণ্ঢাহর রহমতে আপনি তা গ্রহণ করূন। তাদের জন্য আপনার শাফায়াত ও মহব্বত প্রার্থনা করি। 'আসসালামু আলাইকুম ইয়া রাসুলুল- াহ, সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া বারিক ওয়া সাল- াম'। হে আলণ্ঢাহর রসূল, আপনার নিকট অসংখ্য সালাম ও দরূদ।

আল- াহুম্মা আমিন।

শরীর মন উজাড় করে আলণ্ঢাহর দরবারে প্রার্থনা করতে হয়। আলণ্ঢাহ বান্দার কাতর বাণী ও চোখের পানি পছন্দ করেন। বিগত জীবনের পাপকে মনে করে আল- াহর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। চোখের পানি ফেলে হাউমাউ করে কেঁদে ক্ষমা চাইবে। মহান আলণ্ঢাহ রাব্বুল আলামীন ক্ষমা করবেন আশা করা যায়। আমরা বিদায়ের বিরহ মনে নিয়ে মদিনা থেকে দেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

নারীকুলের শ্রেষ্ঠ রমণী

আরবের একটি ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিবি খাদিজা ৫৫৫ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম ছিল খুয়াইলিদ ও মাতার নাম বিবি ফাতিমা। বিবি খাদিজার আগমনে আরবের আকাশ ও খুয়াইলিদ পরিবারে আনন্দের বন্যা বয়ে গেলো। পূণ্যভূমি আরবের আকাশে ধ্বনিত হলো, 'আসসালামু আলাইহি ইয়া আইয়্যাতুন্নিছা'। খাদিজার সৌন্দর্যে আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশী পুলকিত হলো। খুয়াইলিদ আনন্দে আত্মহারা হয়ে গরীব-দুঃখীদের অনেক ধনসম্পদ দান করলেন। পাড়া প্রতিবেশী ডেকে উৎসবের আয়োজন করলেন। অন্যান্য শিশুদের চাইতে তার বালিকাসুলভ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। তার ছোট্ট কণ্ঠের সুমিষ্ট কথা শুনে সবাই তুষ্ট হতো। নারীকুলের শ্রেষ্ঠ রমণী শৈশব থেকেই মায়ের সাংসারিক কাজে সহায়তা করতেন।

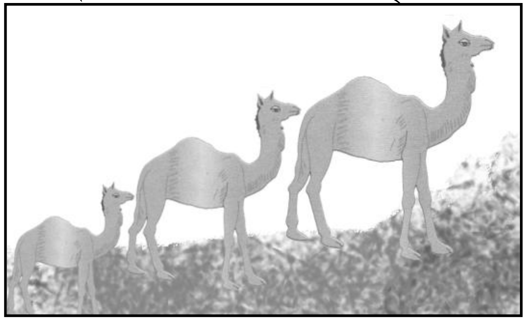

বিবি খাদিজার পিতা একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। পারিবারিক শিক্ষা ও আদর্শ বাল্যকাল থেকেই তার চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছিলো। পিতা-মাতার আদর্শে বৈষয়িক ও সামাজিক শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন। যা পরিণত বয়সে খাদিজাকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিলো। তার আদর্শ শিক্ষাই মহানবী (সা.) কে আকৃষ্ট করেছিলো, যা পরবর্তীতে বিবাহবন্ধনে পরিণত হয়। বিবি খাদিজার স্নেহ শীতল পরশ ও অনুপ্রেরণায় মহানবী (স.) -এর জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে।

কিশোরী খাদিজার রূপলাবণ্য এবং যৌবনশ্রী বৃদ্ধি পেতে থাকে বয়স বাড়ার সাথে সাথে। চরিত্র, জ্ঞান, বুদ্ধি শিক্ষা-দীক্ষা এবং রূপ লাবণ্যের কথা দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। তার রূপ লাবণ্য সৌন্দর্য, তার মহিমান্বিত কীর্তি সবাইকে মুগ্ধ করে তোলে। তৎকালীন আরবের অধিবাসীরা বংশমর্যাদাকে বেশি গুরূত্ব ও প্রাধান্য দিতো। বংশীয় ও ধনাঢ্য ব্যবসায়ী খুয়াইলিদের কন্যার জন্য অনেক বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকে। বিচক্ষণ পিতা-মাতা বনেদি এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের বুদ্ধিমান, চরিত্রবান আবু হাওলা নামক সুদর্শন এক যুবকের

সাথে ধুমধাম করে খাদিজার বিবাহ দেন। আবু হাওলার সাথে খাদিজার সংসার জীবন আনন্দময় পরিবেশেই চলছিল। বিবাহের মাত্র কয়েক বৎসর পর আবু হাওলা ইন্ড়েকাল করলে খাদিজা ভারাক্রান্ড় হৃদয়ে পিতার গৃহে চলে আসেন। কিশোরী খাদিজা বিধবা হলেও তার রূপগুণ বংশ মর্যাদার জন্য পুনর্বিবাহের প্রস্ড়াব আসতে থাকে। খাদিজার পিতার অঢেল সম্পত্তি ও সামাজিক মর্যাদার জন্য খাদিজাকে পত্নীরূপে পাওয়ার জন্য অনেকেই উৎসাহী হলো। পিতা খুয়াইলিদ খাদিজাকে আতিক ইবনে জায়েদ নামে এক যুবকের সাথে বিবাহ দেন। তাদের সংসার সুখেই কাটছিল। তাদের ঘরে একটি কন্যা সন্ড়ান জন্মের পরই আতিক ইবনে জায়েদ মৃত্যুবরণ করেন। খাদিজা বেদনাহত হৃদয়ে পিতৃগৃহে চলে আসেন। পরপর দু'জামাতার মৃত্যুতে খাদিজার পিতা ভেঙ্গে পড়েন। পূর্বে যারা খাদিজাকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক ছিলো তারা তাকে স্ত্রীরূপে পাওয়ার বাসনা করলো।

বিবি খাদিজার বারবার বিবাহ হওয়ার পিছনে মহান আলণ্ঢাহর নিগূঢ় রহস্য লুকায়িত ছিল। তিনিই হবেন উম্মুল মোমেনিন, ইসলামের দ্বাররক্ষক। তার অর্থ দ্বারা উপকৃত হবেন নওমুসলিম, গরীব-দুঃখী মানুষ। তিনিই হবেন মুসলিম জাহানের আখেরি নবী রসুলুহ সাল- ল- হু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢামের সর্বসেরা প্রিয় সহধর্মিণী। তার মাধ্যমেই নবীবংশ তথা মুসলিম জাহানের বংশ বৃদ্ধি পাবে। তার পক্ষে সাধারণ মানুষের সাথে জীবন যাপন ও ঘরসংসার করা কি সম্ভব? এখানেই মহান সৃষ্টিকর্তার অমোঘ নিয়ম তকে বারবার বিধবার বসন পরিয়ে ব্যথিত করেছে। পরবর্তীতে তাকেই আবার ইহকাল ও পরকালের শ্রেষ্ঠ রমণীর মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

বিবি খাদিজার পিতা ক্রমশ বৃদ্ধ হলে তিনি কন্যার জন্য চিন্ড়িত হলেন। তাঁকে হাশেমী বংশের আব্দুলণ্ঢাহর পুত্র মুহম্মদ (সা.) এর নিকট পাত্রস্থ করতে মনে মনে আশা পোষণ করলেন। কিন্তু তখনও মুহম্মদ (স.) বয়োপ্রাপ্ত হননি। ভাতিজা অরকা ইবনে নওফেলকে তার মনের কথা ব্যক্ত করে কিছুদিন পর খুয়াইলিদ ইন্ড়েকাল করেন। পিতার মৃত্যুর পর বিবি খাদিজা পিতার ব্যবসার যাবতীয় দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে কতিপয় বিশ্বস্ড় ব্যক্তিকে তিনি ব্যবসার কাজে নিয়োগ করেন। পিতার সম্পত্তি ও স্বামীদের নিকট প্রাপ্ত অনেক সম্পত্তির মালিক হলেন খাদিজা। তিনি একজন সৎ, দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারী খুঁজতে থাকেন, যার হাতে ব্যবসা ন্যস্ড় করে নিশ্চিন্ড় থাকতে

পারেন। তিনি দরিদ্র আত্মীয়স্বজনদের মধ্য ব্যবসায়ের কার্য ভাগ করে দেন। এতে তাদের ভরণপোষণ নির্বাহ হয়। এজন্য ব্যবসায়ী মহলে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। তার ব্যবসা পূর্বের চাইতে বেশি প্রসার লাভ করে। এতে আরও দক্ষ ও অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন দেখা দিল। বিশেষ করে বিবি খাদিজা এমন একজন লোক খুঁজছিলেন, যার হাতে ব্যবসা ন্যস্ড় করতে পারেন এবং যিনি তার ব্যবসার সর্বাধিনায়ক হতে পারেন।

এদিকে কুরাইশ বংশীয় আব্দুল মুত্তালিবের দৌহিত্র, আব্দুলণ্ঢাহর পুত্র মুহম্মদ (স.) 'আল আমিন' উপাধিতে ভূষিত। বাল্যকাল থেকেই তিনি জনসাধারণের নিকট সাদিক বা সত্যবাদী বলে প্রশংসিত ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি চাচা আবু তালিবের মেষ চরাতেন এবং চাচার সাথে শ্যাম, ইয়ামেন, বসরা বিভিন্ন দেশে ব্যবসার কাজে যেতেন। চাচার সংসারের অসচ্ছলতা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। এতিম মুহম্মদ ভালবাসার কাঙাল ছিলেন। চাচা আবু তালিব মুহম্মদ (সা.) কে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। চাচার সংসারের অসচ্ছলতা দেখেই তিনি চাচার এবং নিজের প্রয়োজনে ব্যবসাকে উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ড় নেন। শৈশব থেকেই চাচা আবুল তালিব ও আমির হামজার ব্যবসার কাজে নিয়োজিত থেকে তিনি একজন সফল ব্যবসায়ী হিসাবে আরবের সর্বত্র খ্যাতি অর্জন করেন। বিবি খাদিজা মুহম্মদ (সা.) এর সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ড়তা এবং ব্যবসা পরিচালনায় কৃতিত্বের কথা শুনতে পান। তিনি লোক পাঠিয়ে মুহম্মদ (সা.) কে বাড়ি ডেকে তার ব্যবসা-বাণিজ্যের সহযোগিতার কথা জানান। মুহম্মদ (সা.) চাচা আবু তালেবের অনুমতি সাপেক্ষে খাদিজার প্রস্ড়াবে সম্মতি জানান। মুহম্মদ (সা.) শ্যামদেশে বাণিজ্য করে অধিক লাভবান হন। এতে বিবি খাদিজা মুহাম্মদ (স.) এর পারিশ্রমিক অধিক পরিমাণে বাড়িয়ে দিলেন। এরপর থেকে খাদিজা তাঁকে ব্যবসায়ের সকল দায়িত্ব ন্যস্ড় করলেন। সুযোগ্য একজন সহকর্মী পেয়ে খাদিজা আলণ্ঢাহর দরবারে শোকরিয়া জানালেন।

সিরিয়া, শ্যাম, বসরা প্রভৃতি স্থানে মুহম্মদ (সা.) নিয়মিত ব্যবসার কাজে ভ্রমণ করতেন। অত্যন্ড় সৎ ও নিষ্ঠার সাথে ব্যবসা করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেন। বিবি খাদিজা পূর্বের চেয়ে বেশি সম্পদের মালিক হলেন। তিনি গরীব-দুঃখীদের মাঝে দুহাতে দান করেন আর আলণ্ঢাহর নিকট শোকরিয়া আদায় করেন। কিছুদিনের মধ্যেই খাদিজা আরবের ধনী লোকদের মধ্যে মান, যশ সম্মানে শ্রেষ্ঠ হয়ে ওঠলেন। এতে তার মধ্যে কোনো হিংসা ও অহংবোধ ছিলো না। তার

উত্তম চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে মক্কার জনগণ তাকে তাহেরা (পবিত্র) বলে সম্বোধন

করতো। পুতপবিত্র খাদিজার মনে মুহম্মদ (সা.) এর প্রতি এক নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হলো। মুহম্মদ (সা.) নির্দিষ্ট দিনে ব্যবসা থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ড় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। কোনো কাফেলা দেখলেই এগিয়ে যেতেন।

একবার অধীর আগ্রহে কাফেলার দিকে এগিয়ে গেলেন, দেখতে পেলেন, সুদর্শন যুবক মুহম্মদ উটের পৃষ্টে বসে আছেন। হঠাৎ খাদিজার চেহারা মুবারক হতে আলো বিচ্ছুরিত হলো। তার অন্দ্ররে খুশির বন্যা বয়ে গেলো। খাদিজা দেখলেন দুটি পাখি বিরাট পাখা মেলে মুহম্মদের কাফেলার উপর ছায়া দান করছে। তিনি আগেও শুনেছেন ছায়া দানের কথা। আজ নিজ চোখে অবলোকন করলেন। মুহম্মদের উপর তার অন্দ্ররের ভালবাসা মায়া-মমতার উদয় হলো এবং তাকে উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল করে তুললো। সমগ্র মক্কা নগরী মুহম্মদ (স.) এর গুণাবলীতে পঞ্চমুখ ছিলো। অপরদিকে অলৌকিক কার্যাবলী দেখে মুহম্মদ (সা.) এর প্রতি খাদিজা আকৃষ্ট হলেন। মুহম্মদ (সা.) কে তার 'মনের মানুষ' হিসাবে নির্বাচিত করলেন। বিবি খাদিজা স্বপ্নে দেখলেন, আকাশ থেকে যেন মধ্যাহ্নের সূর্যরশ্মি তার ঘরে প্রবেশ করলো এবং আলোর কিরণ আরবের চারদিকে ছড়িয়ে গেলো। স্বপ্নের বিবরণ শুনে খাদিজার চাচাতো ভাই অরকা বিন নওফেল ব্যাখ্যা দিলেন, শীঘ্রই আখেরি জামানার নবী মুহম্মদ (সা.) এর সাথে তার বিয়ে হবে। স্বপ্নের অর্থ শুনে খাদিজার মনের ইচ্ছা আরও প্রবল হলো। বিবি খাদিজার সহচরী নাফিসাকে মনের কথা ব্যক্ত করলেন এবং নাফিসাকে মুহম্মদের নিকট প্রেরণ করলেন। মুহম্মদ (স.) নাফিসার মুখে সকল কথা শুনলেন, সম্মত হলেন এবং চাচার সাথে পরামর্শ করলেন। চাচা আমির হামজা বিবাহের পয়গাম প্রেরণ করলেন। খাদিজার রূপ, গুণ বংশমর্যাদা সম্পদ সম্পর্কে মক্কাবাসীরা জানতেন। এদিকে মুহম্মদ (স.) এতিম দরিদ্র হলেও মক্কায় শ্রেষ্ঠ বংশীয় সাদিক ও আল আমিন উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তাই কোনো পক্ষেরই অমত দেখা দিলো না। খাদিজার পক্ষ থেকে চাচা ইবনে আসাদ বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা বলে দিন-তারিখ ধার্য করলেন। শুভদিনে বিবি খাদিজার সাথে মুহম্মদের (স.) শুভ শাদি মুবারক সম্পন্ন হলো। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানব-মানবী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন। বিয়েতে মুহম্মদ (সা.) ২০টি উট দেনমোহর হিসাবে প্রদান করেন। আরবের প্রথা অনুযায়ী এই বিয়ে সম্পন্ন হয়। কী মধুর মিলন! অসম বয়সের দুটি মানব-মানবী একসূত্রে আবদ্ধ হলেন। এ সময় বিবি খাদিজার বয়স ছিল ৪০ বৎসর আর মুহম্মদের (স.) বয়স ছিল

২৫ বৎসর।

বিয়ের পর বিবি খাদিজা, প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন- এখন থেকে আমার সমুদয় সম্পত্তির মালিক মুহম্মদ (সা.) আর আমি তার জীবনসঙ্গিণী মাত্র। পিতা-মাতা দাদাকে হারিয়ে চাচা আবু তালিবের অভাবক্লিষ্ট সংসারে আশ্রিত মুহম্মদ (সা.) অঢেল সম্পদের মালিক হলেন। খাদিজার সম্পদ এখন মুহম্মদের (সা.) সম্পদ। এই সম্পদ পরবর্তীতে তিনি ইসলামের খেদমতে ব্যয় করেন। এই বিত্ত-বৈভব মুহম্মদকে (সা.) কখনও কক্ষচ্যুত করেনি। বরঞ্চ পূর্বের থেকে দ্বিগুণ উৎসাহে মুহম্মদ (সা.) ধর্ম প্রচারে মনোযোগ দিলেন। বিবি খাদিজাও তাকে সামাজিক ও ধর্মীয় কার্য সম্পাদনে সহযোগিতা করেছেন।

মুহম্মদ (সা.) এর এই বিয়ে হয়েছে নবুয়ত প্রাপ্তির আগে। তখন মুহম্মদ (সা.) এর শত্রর্ অভাব ছিলো না। হেরা পর্বতের গুহায় নির্জনে তিনি ধ্যান করতেন। বিশ্ব পালকের ইবাদত করতেন। হযরত খাদিজা হেরা পর্বতের গুহায় খাদ্য, পানি, খেজুর সরবরাহ করতেন। পরম শত্রর্ চোখকে ফাঁকি দিয়ে আলণ্ঢাহর ধ্যানে মুহম্মদ (সা.) মশগুল থাকতেন। আলণ্ঢাহর সৃষ্টি ও মাহাত্ম্য নিয়ে ধ্যানমগ্ন স্বামীর অন্যমনস্ক ভাব দেখে খাদিজা চিন্ড়ায় অস্থির হন। ধৈর্যের সাথে তিনি স্বামীর সাহচর্যে থেকে তাকে সহযোগিতা করেছেন। ঘোর শত্রর্ কবল থেকে রক্ষার জন্য খাদিজা স্বামীকে আগলে রেখেছেন। হেরা পর্বতের গুহায় অবস্থানকালে ফেরেশতা জিব্রাইল মুহম্মদ (সা.) এর নিকট আসতেন। 'ইয়া মুহম্মদ' বলে ডাকতেন। এতে মুহাম্মদ ভয় পেতেন। স্ত্রী খাদিজাকে বাড়ি এসে সব ঘটনা বলতেন। খাদিজা স্বামীকে সান্ড্বনা দিতেন, আপনি সৎ, আল আমিন। আপনার ভয় পাওয়ার কারণ নেই।

রবিউল আউয়াল মাসের কোনো একদিন হযরত মুহম্মদ (সা.) হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন। এমন সময় ফেরেশতা জিব্রাইল মুহাম্মদ (সা.) এর নিকট আগমন করে তাঁর পরিচয় দেন। এ সময় হেরা পর্বতের গুহা নূরানি আলোয় আলোকিত হলো।

হযরত জিব্রাইল (আ.) মুহম্মদ (সা.) কে এই ৫ খানা কোরানের আয়াত পাঠ করে শুনালেন ও পড়ালেন। "ইকরা বিসমি রাব্বি কাল- াজি খালাক্ব। খালাক্বাল ইনছানা মিন আলাক্ব। ইকরা ওয়া রাব্বুকাল আকরাম। আলণ্ঢাজি আলণ্ঢামা বিল ক্বালাম। আল- ামাল ইনছানা মা'লাম ইয়ালাম।" পর্বতের গুহা থেকে বাড়ি

ফিরে উদ্বেগ ও কম্পিত কণ্ঠে খাদিজাকে ওহী শুনালেন। এরপর হযরত

জিব্রাইল যখনই ওহী নিয়ে আসতেন, মুহম্মদ (সা.) তা মুখস্থ করতেন। অন্যকেও মুখস্থ এমনভাবে করাতেন যে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ড় তা কেউ ভুলতো না। এইভাবে আলণ্ঢাহর বাণী, বেহেশতের ভাষা, পাক কোরআনের অমিয় বাণী ধুলির ধরায় আল- াহর প্রিয় হাবীব মুহম্মদের (সা.) এর নিকট আসতে থাকে। প্রথমে গোপনে পরে প্রকাশ্যে তিনি তা প্রচার শুর¤œ করলেন। সর্বপ্রথম বিবি খাদিজাকে ইসলামের অমোঘ বাণী শ্রবণ করালেন। তিনি পাঠ করে সাথে সাথেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনিই মুসলিম জগতে প্রথম মহিলা মুসলমান। আরবের চারদিকে যখন মুহম্মদ (সা.) এর ঘোর শত্র¤œ; সেই কঠিন মুহূর্তে সহধর্মিণী খাদিজাকে সঙ্গে পেয়ে তার মনের জোর বেড়ে গেলো। তিনি বড় সাফল্য লাভ করলেন।

হযরত খাদিজা রাদিয়াল- াহু আনহার অসাধারণ প্রতিভা যা নবীজীর দাম্পত্য জীবনকে সুখময় করে তুলেছিল। দীর্ঘ ২৫ বৎসর হযরত খাদিজা (রা.) নবীজীর সাথে থেকে সুখ শান্ড়ি দিয়ে ধন্য হয়েছেন। মায়া মমতা প্রেমপ্রীতি দিয়ে মুহম্মদ (সা.) কে এতোই মুগ্ধ করেছিলেন যে, খাদিজার মৃত্যুর পরও মুহম্মদ (সা.) এর অন্ড়র থেকে খাদিজার (রা.) প্রেমময় স্মৃতি মুছে যায়নি। দীর্ঘ সংসার জীবনে একদিনের জন্য হলেও তাদের মধ্যে তিক্ততার কোনো কারণ ঘটে নি। পরম শান্ড়ি তৃপ্তি ও সন্ড়োষের মধ্য দিয়ে তাঁদের দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হয়েছে। ৬৫ বৎসর বয়সে হযরত খাদিজা (রা.) ইহলোক ত্যাগ করেন।

হযরত খাদিজার (রা.) মৃত্যুর পর অবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতার প্রয়োজনে মুহম্মদ (সা.) কয়েকটি বিবাহ করেন। কিন্তু সকল স্ত্রীদের উর্ধ্বে ছিলেন হযরত খাদিজা। তার আসন ও অবস্থান সকলের উর্ধ্বে ছিলো। পরবর্তী কালে হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- হে আলণ্ঢাহর রসূল, আপনি খাদিজার প্রশংসা করেন কেন? তার চাইতে আমার রূপ গুণ কি কম? উত্তরে মুহম্মদ (সা.) বলেছিলেন, আয়েশা, খাদিজা যা ছিলেন, তুমি তা নও। এতে বুঝা যায় যে, হযরত খাদিজার মধ্যে মুহম্মদ (স.) কী বেহেশতি সওগাত লাভ করেছিলেন। দীর্ঘ ২৫ বৎসর দাম্পত্য জীবনকালে হযরত খাদিজার গর্ভে সর্বমোট ৪ কন্যা ও ২ জন পুত্র সন্ড়ান জন্মগ্রহণ করেন। যথাক্রমে বিবি যয়নব, বিবি রোকাইয়া, বিবি উম্মে কুলসুম, সর্বকনিষ্ঠ বিবি ফাতেমা। পুত্রগণ হলেন

কাশেম ও আব্দুলণ্ঢাহ। পুত্রগণ অল্প বয়সেই মারা যান।

মহান রাব্বুল আলামীন হযরত খাদিজা (রা.)কে বিশ্বজাহানের রমণীকুলের জননী হিসাবে সৃষ্টি করেছিলেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধর্মের লোক তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলো। তখনকার কুসংস্কার পরিহার করে নবী মুহম্মদ (সা.) কে তার কঠিন সময়ে গ্রহণ করেছিলেন। অসম বয়সের দুইজন মানব-মানবী তাদের দাম্পত্য জীবনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ড় স্থাপন করে গেছেন। মহানবী মুহম্মদ সাল- াল- াহু আলাইহি ওয়া সালণ্ঢামের পত্নীদের মধ্যে হযরত খাদিজার (রা.) কনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতিমা (র.) এর বংশের ধারাই 'নবী বংশ' বলে পরিচিত। মহান আলণ্ঢাহ তায়ালা কতই না মর্যাদা সম্মান ও গৌরবান্বিত করেছেন হযরত খাদিজা রাদিয়ালণ্ঢাহু আনহাকে।

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর মেরাজ

মহা পরাক্রমশালী আলণ্ঢাহ। যিনি আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই সৃষ্টি করেছেন। তিনি অনাদিকাল থেকে আছেন এবং থাকবেন। আলণ্ঢাহর অসংখ্য ফেরেশতা রয়েছে। দুনিয়াবাসীকে হেদায়েত করার জন্য যুগে যুগে আলণ্ঢাহ অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। আলণ্ঢাহ তার বান্দাদেরকে সুপথে পরিচালনা করার জন্য পূণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তির জন্য অন্ধ মানুষকে হেদায়েত করার জন্য নবী বা রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁরা নিজ নিজ কওমকে হেদায়েতের বাণী শুনিয়েছেন। দুনিয়ার প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর উম্মতকে হেদায়েতের দাওয়াত দেন। তাঁর উপর পবিত্র কোরআন নাযিল হয়। তিনিই বিশ্বব্যাপী ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রবর্তক। হযরত মুহম্মদ (সা.) সকল নবী-রাসূলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর, সর্বশেষ নবী।

যেহেতু তিন সর্বশেষ নবী, তাই আলণ্ঢাহ এবং তাঁর নিদর্শনাদি বেহেশত., দোযখ, বেহেশতের শান্তি, দোযখের শাস্তি, ফেরেশতা, আসমান, নভোমন্ডল, আরশকুরসী মালায়ে আলা প্রভৃতি নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার জন্য মুহম্মদ (স.) কে হযরত জিব্রাইল (আ.) মারফত আহ্বান জানান। এর অর্থ হল তাঁর প্রিয় হাবীবকে তাঁর নৈকট্য লাভ ও সৃষ্টির মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য অবলোকন করানো। আলণ্ঢাহ পাক বলেন, আমি আমার হাবীবকে আমার কুদরতে কামেলার সকল আশ্চর্য নিদর্শনসমূহ অবলোকন করানোই হলো মিরাজের উদ্দেশ্য। কোনো বস্তুকে দেখে বলা আর না দেখে বলার মধ্য অনেক পার্থক্য থেকে যায়। তাই মিরাজের মাধ্যমে আলণ্ঢাহ এবং তার নিদর্শনাদি অবলোকন করানোই ছিল আলণ্ঢাহর ইচ্ছা।

নবুয়তের এগারোতম বৎসরে ২৭শে রজব হযরত জিব্রাইল (আ.) আল-াহর

পক্ষ থেকে হযরত মিকাইল (আ.) কে সঙ্গে নিয়ে আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে নৈশভ্রমণ বা মিরাজের দাওয়াত দেন। এ রাতে নবী মুহাম্মদ (স.) কাবা হাতীমে শুয়েছিলেন। হযরত জিব্রাইল (আ.) নবী মুহম্মদ (স.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে অবগত করলেন। যমযম কূপের নিকট নিয়ে তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে যমযমের পানি দিয়ে তা ধুয়ে স্বর্ণ তসতরী পূর্ণ ঈমান ওহিকমত দিয়ে পুনরায় পবিত্র বক্ষে স্থাপন করে দিলেন। অযু করে মহানবী (সা.) দুই রাকাত নামায আদায় করেন। তাঁর পর অপেক্ষমান বোরাকে আরোহণ করলেন। সৌন্দর্যমন্ডিত সেই বোরাকের কপালে লেখা ছিল 'লা ইলাহা ইল-াল-াহু'। বিদ্যুৎ বেগে বোরাক উর্ধ্ব আকাশে ছুটে চললো। অগণিত ফেরেশতা উৎসবমুখর পরিবেশে তখন আলণ্ঢাহর প্রশংসায় রত ছিল। বায়তুল মাকদিসে বোরাক থেমে গেল। তথায় আলণ্ঢাহ পাক পূর্বের নবী রসুলগণকে একত্র করে রেখেছেন। হযরত জিব্রাইল (আ.) মাসজিদুল আকছায় সুমধুর কণ্ঠে আযান দিলেন। তার সুললিত কণ্ঠের আযানের ধ্বনিতে আকাশ পাতাল মুখরিত হলো এবং একসঙ্গে আসমানের সকল দরজা খুলে গেলো। এই দ্বার দিয়ে অসংখ্য ফেরেশতা মসজিদুল আকসায় জমায়েত হলো। অতঃপর ফেরেশতা ও নবী-রসূলগণ মিলে একই জামাতে নামায পড়ার জন্য কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। কিন্তু ইমামের জায়গাটি শূন্য রয়ে গেলো। হযরত আদম (আ.) সৃষ্টির প্রথম মানব। তিনি আশা পোষণ করলেন তার প্রতি আদেশ আসতে পারে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) আশা করলেন, আমি আলণ্ঢাহর খলিল, আলণ্ঢাহর আদিগৃহ কাবার প্রতিষ্ঠাতা। আলণ্ঢাহর হাবীব মুহাম্মদ (স.) এর আগমনের প্রার্থনাকারী, হয়তো আমিই ইমামের মর্যাদার অধিকারী হবো। হযরত মুসা (আ.) আশা পোষণ করলেন তিনি আলণ্ঢাহর সাথে কথা বলেছেন, যাদুকরের যাদু নিজের হাতের লাঠি দ্বারা মিসমার করেছেন। আলণ্ঢাহর ঘোরশত্রু ফিরাউনকে পানিতে ডুবিয়েছেন। এজন্য এ মর্যাদার অধিকারী হবেন। হযরত ঈসা (আ.) বাসনা করলেন, তিনিই একমাত্র আলণ্ঢাহর রূহ দ্বারা সৃষ্ট। আলণ্ঢাহ তাঁকে আপন কুদরতে পিতা ব্যতিরেকে সৃষ্টি করেছেন। ইহুদিদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এজন্য তিনিই এ নামাযের ইমামতির জন্য উপযুক্ত। সবার মনেই নানা কল্পনার উদ্রেক চলছিলো- আল-াহ পাক কাকে এ মর্যাদায় ভূষিত করবেন। নবী মুহাম্মদ (সা.) ভাবলেন পয়গম্বর নবী রসূলগণের নামায এখানে ইমামতি করা সহজ কথা নয়। কে ইমাম হয়ে নামায পড়াবেন? সহসা হযরত জিব্রাইল (আ.) মহানবীর হাত ধরে ইমামের স্থানে দাঁড় করালেন। সেদিন পয়গম্বর ফেরেশতা, হুর গেলমানগণ, সকল মোমিন আত্মা পরিবেষ্টিত জামায়াতে নবী মুহাম্মদ (সা.) ইমাম হয়ে নামায পড়ালেন।

তাইতো তিনি ইমামুল মুরসালিন অর্থাৎ বিশ্বাসীগণের নেতা, আশরাফুল আম্বিয়া। সেই মহিমান্বিত রজনীতে নবীর পেছনে একলাখ চব্বিশ হাজার নবী হাজির হয়েছিলেন। এরপর হযরত আদম (আ.) হযরত নূহ (আ.) হযরত ইব্রাহীম (আ.) হযরত মুসা (আ.) হযরত দাউদ (আ.) হযরত সুলাইমান (আ.) হযরত ঈসা (আ.) নিজ নিজ হেকমত ও মহান আলণ্ঢাহর মহিমার কথা খুতবায় ব্যক্ত করেন। সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স.) দাঁড়িয়ে খুৎবা শুর" করেন, সমস্ড় প্রশংসা একমাত্র আলণ্ঢাহর, যিনি আমাকে আপন নূরে সৃষ্টি করেছেন। আমাকে সৃষ্টি না করলে আসমান জমিন কিছুই সৃষ্টি করতেন না। তিনি আমায় সমস্ড় বিশ্বের রহমতরূপে প্রেরণ করেছেন। তিনি আধ্যাত্মিক জগতে নবুয়ত প্রদান করেছেন আর দৃশ্যমান জগতে সর্বশেষ রাসূল রূপে প্রেরণ করেছেন। যখন আদম (আ.) মাটি ও পানির মধ্যে ছিলেন তখনই আমি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হিসাবে বিদ্যমান ছিলাম। তিনি আমায় পবিত্র কোরআন দান করেছেন। তাঁর মহিমার অন্ড় নাই। হে পরওয়ার দেগার, তোমার প্রশংসা অনন্ড় অসীম, তুমি আমায় হাউজে কাওছার দান করেছো। কিয়ামতের ময়দানে সকল নবী যখন বিব্রত থাকবেন তখন আমিই একমাত্র আপন উম্মতের জন্য চিন্ড়িত থাকব। তারা সবই নাফসী নাফসী বলবেন, আমি বলবো উম্মতি-উম্মতি। আমার উম্মতেরা বেহেশতে না যাওয়া পর্যন্ড় অন্যান্য নবী, উম্মতেরা বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। ইহা তোমার অশেষ কর"ণা। হে আলণ্ঢাহ, সারাজীবন তোমার প্রশংসা করেও শেষ করা যাবে না- হে মা'বুদ, এ সময় নবী মুহাম্মদ (সা.) এর খুতবা শুনে উপস্থিত সকল নবীই বিমোহিত হন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) দাঁড়িয়ে বলেন, আমি আলণ্ঢাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলাম- হে পরওয়ারদেগার, আমাদের আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশে একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর। আমাদের হজ্জের রীতি-নীতি শিখিয়ে দাও এবং ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি তওবা কবুলকারী। হে আলণ্ঢাহ, তুমি তাদের মধ্য থেকে একজন পয়গম্বর প্রেরণ কর, যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করতে পারেন। তাদের কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দিবেন এবং পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই তুমি পরাক্রমশালী ও পরমজ্ঞানী। আমার এ দোয়া কবুল হয়েছে। আলণ্ঢাহ তায়ালা আমার বংশেই আপনাকে প্রেরণ করেছেন। আপনি সকল নবীর শির তাজ। আল- াহ স্বয়ং আপনার প্রতি সালাম পাঠান আর ফেরেশতারা দর"দ প্রেরণ করেন। অতএব আপনিই সৃষ্টিই সেরা। হযরত ইব্রাহীমের ভাষণ শুনে 'মারহাবা ইয়া রাসূলুলণ্ঢাহ মারহাবা' ধ্বনিতে আকাশ পাতাল মুখরিত হলো।

এখানেই পার্থিব ভ্রমণ শেষ করে বোরাক উর্ধ্বাকাশে ছুটে চললো।

অতঃপর নবী মুহাম্মদ (সা.) হযরত জিব্রাইলের সাথে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতা সমভিব্যবহারে আকাশের দিকে ভ্রমণ শুর" করলেন। নভোম"ল নীলফোরাত বিশ্বস্রষ্টার অপরূপ সৃষ্টি দেখে তিনি বিমোহিত হন। দ্বাররক্ষক ফেরেশতা প্রথম আকাশের দরজা খুলে দিলেন। সেখানে প্রথম দেখা হলো- হযরত আদম (আ.) এর সাথে। দ্বিতীয় আসমানে হযরত ঈশা (আ.) ও হযরত ইয়াহিয়া (আ.) । তৃতীয় আসমানে হযরত ইউসুফ (আ.) চতুর্থ আসমানে হযরত ইদ্রিস (আ.) এর সাথে যার কপালে লিখা ছিল- 'লা ইলাহা ইল- াল- াহু মুহাম্মাদুর রাসুলুলণ্ঢাহ' সেখানে নূরানী ফেরেশতাগণ সদাসর্বদা আলণ্ঢাহর জিকিরে মশগুল।

জিবরাইল (আ.) বললেন ' হে আলণ্ঢাহর রসূল, ইনি হচ্ছেন হযরত ইদ্রিস (আ.) যাকে জীবিত অবস্থায় আলণ্ঢাহ পাক আসমানে তুলে নিয়েছেন। নবী তাকে সালাম দিলেন। প্রত্যুত্তরে ইদ্রিস (আ.) স্বাগত জানালেন। মহানবী (সা.) বলেন- ভাই 'ইদ্রিস, আপনাকে আলণ্ঢাহতায়ালা জীবিত অবস্থায় বেহেশতে তুলে নিয়েছেন, তাই বেহেশতের সুখ-শান্ড়ির কথা আপনি বলুন। তিনি বললেন, হে সাইয়্যেদুল মোরসালিন, আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারিনি, শুধু দরজা পর্যন্ড় গিয়েছি, দেখেছি তাতে লেখা আছে- নবী মুহাম্মদ (সা.) এর আগে কোনো নবী এবং তার উম্মতের আগে অপর কোনো নবীর উম্মত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। সোবহানালণ্ঢাহ। আল হামদুলিলণ্ঢাহ। লাখো লাখো শুকরিয়া আলণ্ঢাহ পাকের দরবারে, যিনি আমাদের এই নবীর উম্মত করে সৃষ্টি করেছেন।

চতুর্থ আসমানে কুরসীতে আসীন হযরত আজরাইল (আ.) এর সাথে পরিচয় হলো । তার ভয়াবহ চেহারা ও আকৃতি দেখে মহানবী ভীত হলেন। তিনি আরজ করলেন- ভাই আজরাইল, আপনি কিভাবে জান কবজ করেন। উত্তরে আজরাইল বলেন, আমি তোমার সহকর্মীদের দ্বারা আত্মাসমূহ কণ্ঠনালী পর্যন্ড় টেনে আনাই এবং আমি তা হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করি। মহানবী (সা.) আরজ করেন, 'ভাই আজরাইল, আমার উম্মতের উপর যেন আপনার দয়া হয়। উত্তরে তিনি বলেন, আপনার উম্মতের মধ্য যারা মোমিন আর ইমানদার তারা মায়ের কোলে বসে যেভাবে দুধ পান করতে করতে নিদ্রা যায় সেভাবেই তার আত্মা কবজ করা হবে। অসংখ্য দর"দ সালাম আমাদের প্রিয়নবী (সা.) জন্য যিনি আমাদের মৃত্যুকষ্ট লাঘব করার জন্য হযরত আজরাইলকে সুপারিশ করেছেন। এই আসমানে নবী চন্দ্র ও সূর্য প্রত্যক্ষ করেন। এই চতুর্থ আসমান থেকেই চন্দ্র-সূর্য পৃথিবীতে কিরণ দান করে থাকে।

পঞ্চম আকাশে হযরত হার"ণ (আ.) ৬ষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আ.) সপ্তম আকাশে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর সাথে মহানবী (সা.) এর সাক্ষাৎ হলো।

মহনবী (সা.) এর আকাশের সৃজন নৈপুণ্য দেখে মুগ্ধ হন। এই আকাশের প্রথম ধাপ মুক্তো দিয়ে তৈরী। ২য় ধাপ স্বচ্ছ আয়নার মতো জমাট পানি দিয়ে তৈরী। ৩য় ধাপ আকাশ লোহা দিয়ে তৈরী । ৪র্থ ধাপ আকাশ রূপা, ৫ম আকাশ স্বর্ণ দ্বারা, ৬ষ্ঠ আকাশ হীরা দিয়ে তৈরী, ৭ম আকাশ তৈরী হয়েছে খাঁটি মৃত্তিকা দিয়ে। এখানেই বায়তুল মামুর ফেরেশতাদের ইবাদত গৃহ আসমানী কাবা। সেখানে ফেরেশতাগণ আলণ্ঢাহর এবাদতে মশগুল। এখানে ভ্রমণকারী বোরাক থেমে গেলো। সেখানে আলণ্ঢাহর সৌন্দর্যম–িত কুদরতি বাহন রফরফ অপেক্ষায় ছিল।

মহানবী (সা.) কে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্যই অগণিত ফেরেশতা অপেক্ষায় ছিল। তাদের কণ্ঠে ছিল 'সুব্বুহুন কুদ্দুছুন' আলণ্ঢাহর হামদ ও সানা। মনজিল হতে মনজিলে তিনি সৃষ্টির অপরূপ শোভা অবলোকন করেন। 'রফরফ' আলণ্ঢাহ পাকের আরশে মোয়ালণ্ঢায় পৌঁছলে নবী (সা.) এর হৃদয়ে ভয়াতুর আবেগের সৃষ্টি হয়। এ সময় দুঃসময়ের বন্ধু আবুবকরের কণ্ঠস্বর শুনে কঠিন নিস্ড়ব্ধতা দূর হলো। সেখানে অসংখ্য ফেরেশতা 'লা ইলাহা ইল- াল- াহ' কালেমা পাঠে রত ছিলেন। কাবা কাওয়াছাইনে' আলণ্ঢাহর দিদারে নবী মুহাম্মদ আলণ্ঢাহর উদ্দেশ্যে হামদ ও সানা পাঠ করেন। সকল ফেরেশতাগণ ও আরশবহনকারী ফেরেশতারা অত্যন্ড় উত্তেজনা সহকারে মহান আলণ্ঢাহর প্রশংসা করছে এবং নবীর (স.)এর উম্মতের জন্য দোয়া করছে। তখন পবিত্র আরশে আলীম আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে নবী (স.) কে উদ্দেশ্য করে বলা হলো- হে মহনবী! আপনি আপনার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন। আপনার বন্ধুর সম্মুখে উপস্থিত করার জন্য আপনার উম্মতের পক্ষ থেকে কি নজরানা নিয়ে এসেছেন?

মহানবী (সা.) উত্তর দিলেন- ১ম আত্তাহিয়াতু লিলণ্ঢাহি ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াত্ত্বায়্যিবাতু । অর্থাৎ হে মহান আলণ্ঢাহতায়ালা, মুহাম্মদ তার নিজের এবং সকল উম্মতের পক্ষ থেকে আর্থিক ও শারীরিক সকল ইবাদত নজরানা স্বরূপ পেশ করছি। আপনি তা কবুল কর–ন। মহান আলণ্ঢাহ রাব্বুল আলামীনের

পক্ষ থেকে তাঁর নজরানা কবুল করা হলো। পুনরায় আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে এরশাদ করা হলো- আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবীয়ূ ওয়া রাহমাতুলণ্ঢাহি ওয়া বারাকাতুহু। অর্থাৎ আমি মহান আলণ্ঢাহর তরফ থেকে আপনার প্রতি শান্ড়ি রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক।

নবী মুহাম্মদ (স.) মহান আলণ্ঢাহ রাব্বুল আলামীনের উক্ত সালামের জবাবে পুনরায় আরজ করলেন-

আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইব্রাদিলণ্ঢাহিস সালেহিনা। অর্থাৎ হে প্রভু। আপনার রহমত ও বরকত আমাদের উপর এবং আলণ্ঢাহর সকল নেক বান্দাদের উপর অবতীর্ণ হোক। এইভাবে আলণ্ঢাহ পাকের সাথে সালাম ও জবাবের প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর সকল ফেরেশতাগণ সমস্বরে পাঠ করলেন: আশহাদু আল- া লা ইলাহা ইল- াল- াহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু। অর্থাৎ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আলণ্ঢাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহম্মদ (স.) আলণ্ঢাহর রসুল এবং বান্দা।

অতঃপর মহানবী আরজ করলেন- হে আল- াহ, আপনি হযরত ইব্রাহিম (আ.) কে বন্ধুত্বের মর্যাদা দিয়ে 'খলিল' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তার জন্য

১। নমর–দের সাজানো অগ্নিকু–কে বেহেশতের বাগানে পরিণত করেছেন।

২। মুসা (আ.) কে তুর পর্বতে ডেকে কথা-বার্তা বলে তাকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন।

৩। মুসা (আ.) কে ফেরাউনের হাত থেকে নীলনদ পার করে রক্ষা করেছেন।

৪। হযরত দাউদ (আ.) কে সমগ্র পৃথিবীর সালতানাত ও বাদশাহী দান করেছেন। আপনি নিজ মেহেরবাণীতে তাঁর হাতের স্পর্শে কঠিন লোহাকে মোমের ন্যায় নরম করে দিয়েছেন।

৫। হযরত সোলাইমানকে (আ.) কে সমগ্র বিশ্বের সকল পশু পাখির ভাষা ও আওয়াজ বুঝার তাওফিক দান করেছেন।

৬। অতঃপর মহানবী (সা.) আরজ করলেন- হে আমার প্রভু, আপনি স্বীয় ফজল ও করমে হযরত ঈসা(আ.)কে ইনজিল দান করেছেন।

৭। মহানবী (স.) আলণ্ঢাহ পাকের নিকট সর্বশেষ প্রশ্ন করলেন- হে সর্বশক্তিমান প্রভু, আপনি কিয়ামতের দিন কড়ায়-গ–ায় আমলের সুক্ষ্ম হিসাব গ্রহণ করবেন। সেদিন আমার উম্মতের হিসাব যেন আমার হাতে সোপর্দ করা হয়। যাতে আমার উম্মতের গুনাহ এবং দোষ-ত্র–টি অন্য কেউ জানতে না

পারে। মহান আলণ্ঢাহ নবীকে আশ্বস্ড় করে বললেন:

১- হে আমার হাবীব, আজ আমি আপনাকে আমার খলিল এবং হাবীব হিসেবে গ্রহণ করলাম এবং আপনার গোনাহগার উম্মতের জন্য দোযখের আগুন নিভিয়ে দিলাম।

২- হে মুহম্মদ হযরত মুসাকে ডেকে তুর পর্বতে কথা বলেছি। আর আপনাকে সরাসরি কাবা কাউসাইনে ডেকে এনে মহাসম্মানে ভূষিত করেছি।

৩- হে নবী আমি মূসাকে নীল নদ হতে রক্ষা করেছি। তার পরিবর্তে আপনার সন্তুষ্টির জন্য আপনার উম্মতকে কিয়ামতের দিন পুলসিরাত পার করার তাওফিক প্রদান করলাম।

৪- মহান আলণ্ঢাহ বলেন- হে নবী, দাউদকে দুনিয়ার বাদশাহী দান করেছি। তার পরিবর্তে আমি আপনাকে দুনিয়া ও আখিরাতের সরদারী দান করেছি। আমি আপনার জন্য দুনিয়ার সকল মাখলুকের অন্ড়রকে মোমের মতো নরম করে দিয়েছি।

৫- আলণ্ঢাহ বলেন- হে হাবীব, আমি হযরত সুলায়মানকে জীব-জন্তুর ভাষা বুঝার তৌফিক দান করেছি তার পরিবর্তে আমি আপনাকে এবং আপনার উম্মতের খাতিরে আপনাকে উম্মতে মুহাম্মদীর সম্মানে ভূষিত করেছি। আপনাকে মহামূল্যবান বস্তু দান করেছি, যা পৃথিবীর সকল জীবজন্তুর ভাষা হইতে উত্তম।

৬- আলণ্ঢাহ বলেন, আমি হযরত ঈসাকে ইনজিল কিতাব দান করেছি, আর আমি আপনাকে অতি মহামূল্যবান কালামে পাক কুরআন মজিদ প্রদান করেছি যা কিয়ামত পর্যন্ড় অক্ষুণ্ন থাকবে।

৭- মহান আলণ্ঢাহ কিয়ামত প্রসঙ্গে বলেন- হে মহান নবী! আপনার উম্মতের গোনাহ অন্যের কাছে এবং আপনার কাছেও যাতে প্রকাশ না পায় আমি তাই চাই। যেহেতু আমার নাম হচেছ 'সাত্তার' অর্থাৎ গোপনকারী। আমার সিফাতি নামের বদৌলতে তাদের গোনাহ আমি

ক্ষমা করে দিব। যদি তারা কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়। এই কথা বলে নবী (সা.) কে আলণ্ঢাহ তায়ালা আশ্বস্ড় করলেন। মহান আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য নাজাতের বাণী ঘোষণা করা হলো আল-াহতায়ালা নবী এবং তার উম্মতের জন্য ৫০ ওয়াক্ত নামায ফরজ করার ঘোষণা দিলেন। নবী (সা.) এ সময় আলণ্ঢাহর মহব্বতে এতই নিমজ্জিত ছিলেন যে, এই নামায আদায়ে কতটুকু কষ্ট হবে তা তিনি ভেবে দেখেননি।

দু'বন্ধুতে নিবিড় ও ঘনিষ্ট আলাপ আলোচনার পর আলণ্ঢাহ তার প্রিয়বন্ধুকে বেহেশত দেখার জন্য অনুরোধ করলেন। মহানবী মালায়ে আলা থেকে নেমে

সিদরাতুল মুনতাহায় হযরত জিব্রাইলের সাথে তিনি জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রবেশ করলেন। বেহেশতবাসীর শান্ড়ি ও পরম আনন্দে নবী খুশি হন।

দোযখবাসীর ভয়াবহ অবস্থা দেখে নবী (স.) ভীত হলেন। আলণ্ঢাহর ইচ্ছায় তখন দোযখের পর্দা সরে গেলো এবং মুহূর্তে তা তাঁর চোখের আড়াল হলো। দোযখের কঠিন অবস্থা দেখে মহানবী বলে উঠলেন, আলণ্ঢাহুম্মা ফাতনা, আলণ্ঢাহুম্মাহ ফাতনা। অর্থাৎ হে আলণ্ঢাহ, দোযখের এ বিভীষিকাময় শাস্ড়ি থেকে আমাদের রক্ষা করুন।

কোনো কোনো বর্ণনায় আছে তিনি এই দোয়া পাঠ করেছিলেন-

আলণ্ঢাহুম্মা ইন্নি আউযুবিকা মিন আযাবি জাহান্নাম। অর্থাৎ হে আলণ্ঢাহ, আমি আপনার নিকট জাহান্নামের শাস্ড়ি থেকে পানাহ চাই। আমাকে জাহান্নামের শাস্ড়ি থেকে রক্ষা করুন।

মহানবী (সা.) যখন ৫০ ওয়াক্ত নামায আলণ্ঢাহ তায়ালার নিকট হতে উপঢৌকন ও উপহার নিয়ে কাবা কাওসাইন হতে মেরাজ শেষ করে উম্মতের নিকট ফিরে আসতে থাকেন তখন হযরত মুসা (আ.) এর উপদেশ মোতাবেক মহান আলণ্ঢাহর দরবারে নয়বার (৯×৫) ফিরে গিয়ে পয়তালিণ্ঢশ ওয়াক্ত নামায কমিয়ে আনেন। মহান আলণ্ঢাহ ঘোষণা দেন- হে নবী! আমার মহান সত্তার পক্ষ থেকে কোনো কথা পরিবর্তন করা হয় না এবং আমি আমার বান্দার উপর বেশী কষ্ট দিতে চাই না। তাই আপনি এবং আপনার উম্মতগণ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করলে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের ফজিলত দান করা হবে। সোবহানালণ্ঢাহ। নবী মুহম্মদ (সা.) আলণ্ঢাহর নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করে বোরাকে আরোহণ করে বায়তুল মাকদাসে অবতরণ করেন।

যেহেতু রজব মাসেই নবী মুহম্মদ (স.) সালামের নৈশ্য ভ্রমণ মিরাজ সংঘটিত

হয়েছিলো, এ জন্য এ মাসের ফজিলত ও বরকত অনেক বেশী। আরবী বারোটি মাস যথা মহররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস সানী, জমাদিউল আউয়াল, জমাদিউস সানী, রজব, শাবান রমজান শাওয়াল, জিলহজ্ ও জ্বিলকদ। আলণ্ঢাহ তায়ালা প্রতিটি মাসের আলাদা বৈশিষ্ট্য, স্বতন্ত্র মর্যাদা, মরতবা ও ফজিলত আমাদের দান করেছেন। এর মধ্য মহররম, রবিউল আউয়াল, রজব, শাবান, রমজান ও জ্বিলহজ্জ মাস অশেষ মরতবা পুর্ণ ও ঘটনা সমৃদ্ধ। পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামায, শবে মেরাজ, রমযান, শবে কদর, লাইলাতুল বরাত যথারীতি পালন করে আলণ্ঢাহর রহমত ও করুণা লাভ করতে পারি। রজব মাস হিজরি বৎসরের সপ্তম মাস। ফজিলতের দিক থেকে এ মাসের স্থানও

উর্ধ্বে। এ মাসেই মহানবী (সা.) এর মেরাজ বা আলণ্ঢাহর সাথে দিদার সংঘটিত হয়। তাঁকে আলণ্ঢাহ তায়ালা অশেষ নিয়ামত, বরকত রহমত ও ফজিলত দান করেছেন তার মধ্যে মেরাজ অন্যতম। রজব মাসের চাঁদ দেখলেই নবী মুহম্মদ (সা.) দুহাত তুলে দোয়া পাঠ করতেন।

হে আলণ্ঢাহ, আমাদেরকে রজব ও শাবান মাসে বরকত দান কর ্ন এবং রমযান পর্যন্ড় পৌঁছে দিন।

'আসসালাতু ওয়াস সালামু আলাইকা ইয়ারসুলুলণ্ঢাহ।' অসংখ্য দরূদ ও সালাম নবী মুহম্মদের জন্য। কুরাইশরা যখন মেরাজের ঘটনা শুনলো তখন তারা নানাভাবে নবী মুহম্মদ (সা.)কে উপহাস শুর ু করলো। তাদের মধ্য সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী বুদ্ধিমান আবু জেহেল নবী (সা.) কে প্রশ্ন করলো, আচ্ছা মুহাম্মদ, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহলে বলো- বাইতুল মুকাদ্দাসের কয়টি দরজা আর মিনার কয়টি। মহানবী (সা.) উপহাসমূলক প্রশ্নে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। আর তৎক্ষণাৎ আলণ্ঢাহ পাক তাঁর হাবীবের অবস্থা বুঝে জিব্রাইল (আ.) কে বললেন- বাইতুল মুকাদ্দিসখানা নবীর সম্মুখে তুলে ধরতে। নবী (সা.) মুহূর্তেই চক্ষের সম্মুখে দেখে তাদের উপযুক্ত জবাব দিলেন। আমাদের নবী মুহাম্মদকে আলণ্ঢাহ কতো ভালবাসতেন। এই পবিত্র মাসেই মেরাজের ব্যবস্থা করে আলণ্ঢাহ তার সৃষ্টিরহস্য নবী (স.) কে প্রত্যক্ষ করিয়ে আমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ তুলে ধরেছেন। রজব মাসে নফল এবাদত করে আমরা অশেষ পুণ্যের অংশীদার হতে পারি- 'আসসালাতু মেরাজুল মুমেনীন'- নামাযই হলো মোমিন বান্দার জন্য মেরাজস্বরূপ। ২৭ রজব নফল এবাদত, দর ্দ কোরআন পাঠ, তসবীহ তাহলীল পাঠ করে আমরা আলণ্ঢাহর সন্তুষ্টি লাভ ও অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করতে পারি।

সূত্রঃ ধর্মীয় পুস্ড়কাদি অবলম্বনে রচিত।

ভারত ভ্রমণ

জামাতা আব্দুল মুত্তালিব (এ.জি.এম সোনালী ব্যাংক) এর উদ্যোগে নাতনি হাসি-খুশির চিকিৎসার সুবাদে ভারত ভ্রমণের সুযোগ হলো। ছাদের আলী সাহেব ভ্রমণবিলাসী। মেয়ের জামাতাও সময়-সুযোগ করে নিয়ে বাংলাদেশের উলেণ্ঢখ্যযোগ্য ও ঐতিহাসিক স্থানে ভ্রমণ করতে পছন্দ করে।

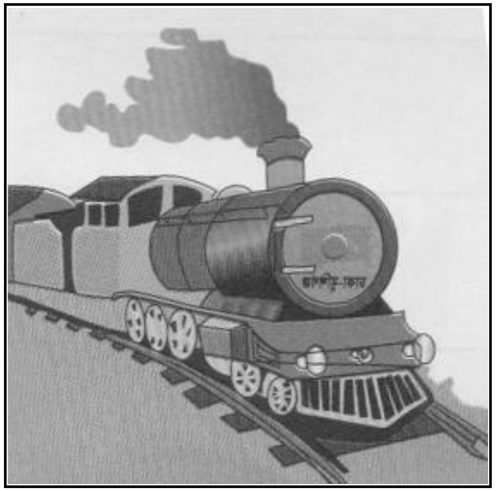

হাসি-খুশি ওরা জমজ দু'বোন। ওদের অর্থোপেডিক্স বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখানো প্রয়োজন বিধায় মাদ্রাজ (চেন্নাই) ভেল্যুর 'সিএমসি' হাসপাতালে যাওয়ার সিদ্ধান্ড় হয়। ভেল্যুর হাসপাতালটি অত্যাধুনিক ও বিলাসবহুল। সেবার মান উন্নত। প্রশাসনিক কার্য ও সেবাদান পদ্ধতি দেশ-বিদেশের মানুষকে এখানে আকর্ষণ করে। ডাক্তার, নার্স সবাই যার যার দায়িত্ব সহাস্যবদনে পালন করছে। অনেকটা এরিয়া জুড়ে এর অবস্থান। এখানে চিকিৎসা ব্যয়বহুল। তার পরও বিভিন্ন দেশের মানুষ উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য এখানে আসে। সদা হাস্যময়ী নার্স ও ডাক্তারদের আন্ড়রিক ব্যবহারে রোগের অনেকটা উপশম হয়।

নানা কারণে মানুষ দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে থাকে। অজানাকে জানার, অদেখাকে দেখার চিরায়ত স্বভাব মানুষের। আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিলো জীবনে একবার ভারত ভ্রমণ বিশেষ করে আগ্রার তাজমহল দেখার লোভ মনে পোষণ করেছিলাম। তবে সে আশা পূরণ হবার কোনো সুযোগ ও সম্ভাবনা নেই। কারণ ভ্রমণে যেমন শারীরিক সুস্থতা দরকার, তেমনি আর্থিক সংগতি থাকা প্রয়োজন। তবে হাসি-খুশির সৌজন্যে ভারতের মাদ্রাজ ভ্রমণের পাসপোর্ট ভিসা তৈরি হলো। শুক্রবার ১৬-০৯-২০০5 তারিখে আমরা ভারতের উদ্দেশ্যে ঢাকা রওনা হই। রাতে নাতনি কান্ড়াদের বাসায় খাওয়া হলো। ছেলে সুজন ও পুতুরা

আব্দুল কাদীর আমাদের গ্রিনলাইন বাসে উঠিয়ে দিলো। যাত্রা হলো শুরু। দীর্ঘ বাস ভ্রমণের ক্লান্ড়ি দূর করার জন্য যশোর এক বিলাসবহুল হোটেলে আমাদের কিছুক্ষণের জন্য সময় দেয়া হলো। চা-নাস্ড়া সেরে আবার যাত্রা শুরু। রাতের বেলা ভ্রমণ বেশ আরামদায়কই মনে হলো। শনিবার সকাল ৭টার দিকে আমরা বেনাপোল চেকপোস্ট পৌঁছে যাই। এখানে এসে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দেখে মনে হলো এ যেন নিজ দেশে পরবাসী। সামান্য কাটাতারের বেড়ার আইনের শাসন দু'দেশই মেনে চলছে। বেনাপোল বাংলাদেশ সীমান্ড়ে হোটেলে আমরা সকালের নাস্ড়া সেরে নিলাম। দু'পা এগোলেই ভারত। এপার বাংলাদেশ সীমান্ড়ে গুটি কয়েক বিডিআর টহল দিচ্ছে; ওপার ভারত সীমান্ড়ে কিছু সংখ্যক বিএসএফের অতন্দ্র প্রহরী রাইফেল কাঁধে ঘুরাঘুরি করছে। কংক্রিটের পাকারাস্ড়ার মাঝখানে গ্রিলের বিরাট মজবুত গেট। জামাতা মুত্তালিব ভিসা-পাসপোর্ট শো করার সাথে সাথে ভদ্রবেশী বিজিএফ দ্বার রক্ষীগণ ভদ্রতা বজায় রেখে গেট খুলে দিলো– আমরা এখন ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে। এ যেন আরেক বাংলাদেশ। ওপার চেকপোষ্টে আনুষ্ঠানিকতা সেরে নিলাম। ভারত দ্বাররক্ষীগণ হাসি-খুশির সাথে আন্ড়রিকভাবে ভাব করতে চাইলো। দিন ১০ টার দিকে আমরা একটি বাসে চড়ে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। পৌঁছতে ২টা বেজে গেলো। মেয়ে জামাতা নাতনিদেরসহ আমরা ছয়জন। কলকাতা এসে গুলিস্ড়ানে ২ রুম বিশিষ্ট হোটেলে সিট হলো। হোটেলের ঠিকানা ৩০F ফ্রি স্কুল রোড ফায়ার সার্ভিস অফিস সংলগ্ন। এখানে বিন্দুবাসিনী বালক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আনন্দ বাবুর ভাগিনা কৃষ্ণ ও প্রভাতের সাথে যোগাযোগ হয়। আনন্দ বাবু আমাদের কলকাতা যাবার খবরটা আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। কৃষ্ণ ও প্রভাত দুই ভাই পর্যায়ক্রমে আমাদের গাইড হিসেবে কলকাতার উলেণ্ঢখযোগ্য ও দর্শনীয় স্থানসমূহ ঘুরিয়ে দেখিয়েছে। মিউনিসিপাল এলাকা বেশ আবর্জনাময়। আমরা ইডেন পার্ক ও ভিক্টোরিয়া পার্কে বেড়ালাম। সেখানে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে অনেক স্থাপনা এখনও রয়েছে। যা খুবই দর্শনীয়। উনিশ শতকের ঐতিহ্যবাহী ঘোড়ার গাড়ি টমটম এখনও কদাচিত চোখে পড়ে। এই গাড়িতে রাণী আনন্দভ্রমণ করতেন। দুপুরে মুসলিম রেস্টুরেন্টে গরুর মাংস ভুনা ও সবজি দিয়ে ভাত খেলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কৃষ্ণকে সাথে নিয়ে আমরা সুদর্শন হাওড়া ব্রিজ দেখে তৃপ্ত হলাম। যে ব্রিজের কথা শরৎচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাসে পড়েছি। এর নির্মাণশৈলি অনেক সৌকর্যের, দেখতেও নান্দনিক। আমার সাহেবের খুব সখ ছিলো মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের বাড়ি দেখা। ঠিকানাও নিয়ে গিয়েছিলেন।

বাড়ির নামঃ বেদান্ড়

৫২/৪/১ বালিগঞ্জ, সার্কুলার রোড
কলকাতা।

মানুষের সব আশাই পূরণ হয় না। আমরাও সময় ও সুযোগের অভাবে সেখানে যেতে পারি নাই।

১৮-০৯-০৫ তারিখে আমারা কলকাতা থেকে ভেল্যুর- এর উদ্দেশ্যে রওনা দেই। ট্রেনের টিকিট আগেই কাটা ছিলো। কৃষ্ণ আমাদের হাওড়া ষ্টেশনে করমন্ডল ট্রেনে তুলে দিয়ে গেলো। বিলাসবহুল এই ট্রেনটি বিরাট আকারের। দেখতে দেখতে যেন আর শেষ হয় না ট্রেনের সহযাত্রী হিসাবে আমাদের কামরায় কলকাতার দু'জন ছেলে পেলাম। ওরাও চিকিৎসার জন্য ভেল্যুর যাচ্ছে। ওদের একজনের নাম বিশ্ব। পথের এই দু'জন বন্ধু ভেল্যুর পর্যন্ত গিয়েও আমাদের সাথে যোগাযোগ রেখেছে। ভেল্যুর কটেজে হাসি-খুশিকে দেখতে আসতো আপন আত্মীয়ের মতোই। কলকাতা থেকে উড়িষ্যা,অন্ধ্র প্রদেশ হয়ে তামিলনাড়ু, তারপর মাদ্রাজ বা চেন্নাই পৌছে লোকাল ট্রেনে করে ভেল্যুর। কলকাতা থেকে মাদ্রাজ বা চেন্নাই পৌঁছতে সময় লাগে প্রায় ৩০ ঘন্টার মতো। আরামদায়াক ট্রেন সার্ভিস বিধায় ভ্রমণে তিক্ততা আসেনি। ট্রেনটি সর্পিল গতিতে রাতের আঁধার ভেদ করে চলছে। কখনও ভোরের ঝলমলে আলো ও বাতাসে ট্রেনের ঝক্‌ঝক্‌ শব্দ মধুর লাগছে। আবার তারস্বরে হুইসেলের আওয়াজ কর্ণের গভীরে আঘাত হানছে। মনে হয়, যন্ত্রদানবের পেটের ভিতর শত শত মানুষ কিলবিল করছে। কেউ হাঁটছে, কেউ বাইরের দৃশ্য দেখছে, দু'একজন বই পড়ছে কেউবা লম্বা ঘুমে সময় পার করে দিচ্ছে। মাঝে-মধ্যে হালকা চা-নাস্তা চলছে। এভাবেই আমরা ভেল্যুর পৌঁছে গেলাম। ষ্টেশন থেকে টেক্সিতে করে হোটেলে পৌঁছাই। প্রথমত হোটেল পেতে খুব কষ্ট হচ্ছিলো। কারণ কোনো আগন্তুক বাইরে থেকে গেলে থানায় রিপোর্ট করতে হয়। অনেক রাতি হয়েছিলো বিধায় আমরা পরের দিন থানায় রিপোর্ট করি। নাতনিদের হাত ধরে হোটেল খুঁজছি। এ সময় দুজন বাঙালি যুবক আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এলো। ওদের সাহায্যে আমরা হোটেল জি,জি,আর লজে সিট পেলাম। বাড়িটি বেশ নতুন। মুখোমুখি ওয়াল সেটের ঘর, প্রায় এক এক তলায় ৮/৯ টি ফ্যামিলি থাকতে পারে। সবাই রোগী নিয়ে এসেছে বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে। রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়লাম। ভ্রমণজনিত ক্লান্তি

তে ভালো ঘুম হলো। ফজরের নামায পড়ে নাস্তার আয়োজন। হাসি-খুশির পছন্দমতো গরুর মাংস ভুনা ও পরোটার সাথে বৃহৎ আকারের সাগর কলা।

হোটেলের ব্যবস্থাপনা খুবই উন্নত। হোটেলের ম্যানেজারটি আদলে হুমায়ূন আহমদের কাপুরুষ উপন্যাসের জমশেদের মত। তার প্রশস্ত বক্ষ, বপুচেহারা, লম্বায় প্রায় ৭ ফুট, চওড়া ও লম্বা গোঁফ। তাকালেই ভয় করতো। খুব কঠিন তার ব্যবহার। কিন্তু ছোট বাচ্চাদের আদর করতো। তার নিয়মকানুন সকলকেই মানতে হতো। ওখান থেকে হাসপাতাল নিকটেই। নতুন কোনো গেস্ট আসলেই অন্যানরা আপন পরিচিতের মতো এগিয়ে আসে। বিশেষ করে চিটাগাং এর ভাবি, পূর্ব মেদেনিপুরের রূপার মা, কলকাতার খ্রিষ্টান বৌদি সবার সাথে কয়েকদিন বেশ আনন্দেই কাটলো। রূপার বাবা বি,এস,এফে চাকরি করতেন। কিডনি সমস্যার জন্য হাসপাতালে ভর্তি। জটিল অপারেশনের পর আর জ্ঞান ফিরে নাই। ১৮/১৯ দিন লাইফ সাপোর্টে থাকার পর মারা গেলেন। আমরা সবাই গভীরভাবে শোকাহত হলাম। দীর্ঘ ভ্রমণজনিত কারণে তাকে কটেজের পাশেই টিপু সুলতানের আমলের গোরস্থানে দাফন করা হলো। রূপার মা, রূপার কান্নায় কটেজ থমথমে হয়ে গেলো। পুরো কটেজ জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এলো । আমি ও চিটাগাংয়ের ভাবী সান্ত্বনা দেই। এই অঞ্চলের ভাষা তামিল। আমাদের নিকট খুব কঠিন মনে হয়েছে। তবে বাংলা ভাষাভাষীও আছে। এখানে মুসলমানদের সংখ্যা ৩০ শতাংশ । এখানে অনেক মহিলা পুরুষে পাশাপাশি কনস্ট্রাকশনের কাজ করছে। মহিলাদের খোঁপায় বেলি ফুলের মালা। গায়ের রং খুব কালো। ২০/০৯/২০০৫ আমরা হাসি-খুশিকে ডাক্তার দেখালাম। অর্থোপেডিকস বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ভেনিসা মাধুরী খুব যত্ন করে ওদের শারীরিক ত্রুটিগুলো দেখলেন। নাম রেজিস্ট্রেশনের পরই ফাইল জমা দিতে হয়। রোগের ধরন অনুযায়ী ডাক্তারের নিকট ফাইল চলে যায়। সিরিয়াল অনুসারে রোগী দেখা হয়। কোনো ঝক্কি ঝামেলা নেই। হাসি-খুশির ডাক্তার ওদের ফিজিওথেরাপির ব্যবস্থা দিলেন। ওদের তিনদিন থেরাপি দেয়া হলো।শিউলী বাদে আমরা চেকআপ সেরে আসলাম। ২৫/০৯/২০০৫ তারিখে আমরা ইতিহাস বিখ্যাত টিপু সুলতানের দুর্গ দেখতে যাই। বিরাট এলাকা জুড়ে প্রাচীরঘেরা দুর্গ। ভগ্নপ্রায় অবস্থায় ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে । এর নির্মাণশৈলী অপূর্ব ও নিপুণ। বড় বড় পাথর কেটে প্রাসাদ ও দুর্গ তৈরি করা হয়েছে। ধন্যবাদ জানাতে হয় তখনকার রাজমিস্ত্রিদের। দুর্গের পাশেই বড়খাল বা নদীর মতো কাটা হয়েছে দুগের পূর্বপাশে। ইতিহাস কথা কয়। হায়দার আলীর পুত্র টিপু সুলতান মহীশুরের অধিপতি ছিলেন। সুলতান তৃতীয় মহীশুরের

যুদ্ধে ইংরেজদের নিকট পরাস্ত হয়ে ৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ ও অর্ধরাজ্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। ইংরেজ, নিযাম ও মারাঠাগণ একত্রে

সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে তাকে সন্ধির জন্য বাধ্য করা হয়। লর্ড কর্নওয়ালিশের এই সন্ধির প্রস্ড়াব দেন। এই “অধীনতামূলক মিত্রতা” সন্ধি সুলতানের নিকট অপমানজনক মনে হয়। তিনি ৪র্থ মহীশুরের যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। শ্রীরঙ্গমপট্টমের দ্বারে অসি হাতে বীরের ন্যায় যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দেন। সমগ্র মহীশুর ইংরেজদের দখলে চলে আসে। সুলতানের ছেলে-মেয়েদের মাদ্রাজ রাজপ্রাসাদে দীর্ঘদিন অবরোধ করে রাখা হয়। আমরা যখন মাদ্রাজ যাই তখন টিভিতে “সোর্ড অব টিপু সুলতান” সিরিয়াল চলছিলো। আর সেদিন ধ্বংসপ্রায় দুর্গ দেখে মনে হলো কত রাজা এলো গেলো রাজ্যপাট ধ্বংস হলো। আজও ভ্রমণপিপাসু পর্যটক দীর্ঘশ্বাস ছাড়েন– কোথায় রাজা কোথায় রাজত্ব! হয়তো এই ধ্বংসাবশেষ কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে। মাদ্রাজে রয়েছে বিখ্যাত “রত্নগিরি” মন্দির।পাহাড়ের উপর এই মন্দিরে ওঠতে গেলে ১৭০টি সিঁড়ি পার হতে হয়। শিউলী ও জামাতা মুত্তালিব এই দুঃসাহসিক কাজটি করতে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়ে যায়। পাহাড়ের উপর কোনো পানীর জলের ব্যবস্থা নেই। এতে ভ্রমণপিপাসুদের অনেক সময় কষ্ট পেতে হয়। ডাক্তার দেখানো ও ভ্রমণ শেষ। দেশে ফেরার পালা।

কটেজ থেকে ফেরার দিন হৃদয়বিদারক দৃশ্য! রূপারাও আমাদের সাথে ফিরলো। বাবা হারানোর বেদনা বুকে নিয়ে দেশে ফিরছে। সবাই লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ হাসি-খুশিকে জড়িয়ে ধরছে। কেউ চোখের জল মুছছে। খ্রিস্টান বৌদি গলায় কাপড় জড়িয়ে গড় হয়ে আমাকে প্রণাম করলো। যেন কত দিনের পরমাত্মীয় ছেড়ে যাচ্ছি। ৩০/০৯/২০০৫ আমরা কলকাতায় ফিরে ফায়ার ব্রিগেডের নিকট গুলশান গেস্ট হাউজে ওঠি। কিছুক্ষণ রেস্ট নিয়ে নিউমার্কেট ও পৌর মার্কেট থেকে বৌদের জন্য শাড়ি ও টুকটাক কেনাকাটা হলো। পরদিন ০১/১০/২০০৫ কৃষ্ণকে নিয়ে সায়েন্স সিটিতে পৃথিবীর আদি অবস্থা ও জীবজন্তু সম্বন্ধে সুন্দর একটি প্রামাণ্যচিত্র উপভোগ করলাম। ০২/১০/২০০৫ তারিখে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা। ফিরতি পথে বেনাপোল বন্দরে অনেক যাত্রীকেই তলণ্ঢাশি করা হলো। আমরা হাসি-খুশির সৌজন্যে

বি,এস,এফ প্রহরীদের নিকট সৌজন্যমূলক ব্যবহার পেলাম। গেট পার হলেই বাংলাদেশ।

যখন আমার এই বইয়ের লেখার কাজ সমাপ্ত তখন আমার সাহেব বললেন ভারত ভ্রমণ সম্বন্ধে কিছু লেখো। লেখাতো ইচ্ছা করলেই হয় না। তবুও তার আবদার এ সম্বন্ধে লিখতেই হবে। এদিকে প্রকাশনার কাজও অনেক এগিয়ে। আমি অপারগতা জানালাম। উনি নাছোড়বান্দা। বললেন- একটা কিছু লেখো ভারত ভ্রমণ সম্বন্ধে। অগত্যা এই ভ্রমণ কাহিনি লেখার আয়োজন। সবশেষে কবিতার সুরে তিনি বললেন-

যখন আমি থাকবো না
করবো না আর কোলাহল
তখন তুমি পাবে কোথা
এমনিতরো মনোবল?